। -া -া -া II { সা রা -মা । মা মা -া I গা গা -া । পা মা -া I
০ • • আ প ন্ ভা বে • আ প • নি য় ০

I পা -া -া । -া পা মা I মা মা -ধা । পা পা -া I
গ • • ন্ ও তার্ ঢু লু ০ ঢু লু ০

I মা মা -া । গমা -পা মা I মপমা -গা -া । (-া -া -া) } I -া পা ধা I
ঢো লে ০ ছু০ ০ ন স্ব০ • ন্ ০ • ০ ০ ও সে

I { ধা র্সা -া । নর্সা -র্রা র্সা I না না -র্সনা । ধা ধনধা -পা } I
কি যে • ন০ ০ ম ধু র ০ ০ বাঁ শি০ ০

I পা ধা -া । পধা -না ধা I পা পমা -গা । গমপা -া -া I
স দা • ই০ ০ ত নি তে০ ০ পা০০ ০ ০

I -া -া -া । গা গা -সা II II
• • য়্ "পা গ ল্"

২

পুরবী। দাদ্‌রা

গাছে ফুল শোভা যেমন, হয় কি তেমন গাঁথলে মালা,
গলায় দিয়ে খানেক মজা, শেষকালেতে হেলাফেলা॥
কোথা সে সৌরভ সুখ,
কোথা সে প্রফুল্ল মুখ,
সে অধরে রসভরে, ভ্রমরে করে না খেলা॥

II { । । গা । পা পা -া I পক্ষা পা -ক্ষনা । ধা পা -ক্ষপা I
গা ছে ফু ল্‌ শো ভা ০০ যে ম ০ন্‌

I ক্ষগা -মা গা । ঋা সা -া I সন্‌া -সন্‌া সা । রা গা -া } I
হ য়্‌ কি তে ম ন্‌ গাঁ ০থ্‌ লে মা লা ০

I -া -া গা । { গা পা ধা I ধা র্সা -া । না ধপা -া I (-া -ক্ষপা গা)} ।
০ ০ গ লায়্‌ দি য়ে খা নে ক্‌ ম জা ০ ০ ০ ০ গ

I পা -ক্ষা পা । ক্ষপা -ধা পা I গা গঋা -গা । ঋা সা -া I
শে ষ্‌ কা লে০ ০ তে হে লা০ ০ ফে লা ০

I সন্‌া -সন্‌া সা । রা গা -া II
গাঁ ০থ্‌ লে মা লা ০

II -া -া { গা । গা পা ধা I ধা র্সা -নর্সর্রা । র্সা র্সা -া I
০ ০ কো থা সে সৌ র ভ ০০০ সু খ ০

I -া -া র্সা । না ধা ধা I ধা পধা -নর্সা । নধা নাঃ -ধঃ I
০ ০ কো থা সে প্র ফুল্‌ ল০ ০০ মু০ খ ০

I -পা -ক্ষপা }{ গপা । পা পা পা I ক্ষা পা -ক্ষনা । ধা পা -ক্ষপা I
০ ০০ সে০ অ ধ রে র স ০০ ভ রে ০০

I -গা -া } গা । ক্ষা ধা পা I গা গঋা -গা । ঋা গা -া I
০ ০ ভ্র ম রে ক রে না০ ০ খে লা ০

I সন্‌া -সন্‌া সা । রা গা -া II II
গাঁ ০থ্‌ লে মা লা ০

'খেলা' উচ্চারণ : খ্যালা

স্বীকৃতি

আচার্য যদুনাথ সরকারের প্রতিকৃতির ব্লক বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ অনুগ্রহপূর্বক ব্যবহার করিতে দিয়াছেন।

কবি রজনীকান্ত সেনের প্রতিকৃতির ব্লক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স্-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

বর্তমান সংখ্যার মলাটে ব্যবহৃত নকশাগুলি শিল্পী শ্রীঅর্ধেন্দু দত্ত বিনাব্যয়ে আঁকিয়া দিয়াছেন।

ইঁহারা সকলেই পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

সংশোধনী

পৃ. ৭০ হইবে : ১৩৫৯ ভাদ্র 'ইতিহাস' ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশে পর্তুগীজ
খ্রীষ্টান সম্প্রদায়
১৩৬০ শারদীয় সংখ্যা 'ঊষা' সংস্কৃত শিক্ষার ভবিষ্যৎ

পৃ. ৭২ : ২০ সংখ্যক পাদটীকার নিচের পঙ্‌ক্তি বর্জনীয়

Editor of "The Friend of India" &c.

জন ক্লার্ক মার্শম্যান

কোলস্‌ওয়াদি গ্র্যাণ্ট অঙ্কিত চিত্র
'লিথোগ্রাফিক স্কেচেস অব দি পাবলিক ক্যারেক্টার্স
অব ক্যালকাটা ১৮৩৭-৪০' গ্রন্থ হইতে

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৬৫ বর্ষ, ২য় সংখ্যা
১৩৬৫

জন ক্লার্ক মার্শম্যান

শ্রীসজনীকান্ত দাস

ভূমিকা

"বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ" বা নীহারিকা-যুগের ইতিহাস ৪৫ হইতে ৪৭ বর্ষের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় ধারাবাহিক ভাবে লিখিয়াছিলাম। ৫১ বর্ষের ৩য়-৪র্থ সংখ্যায় ওই ইতিহাসেরই ধারা ধরিয়া "ফেলিক্স কেরী" লিখি। সুদীর্ঘ পনের বৎসর কাল পরে শ্রীরামপুর মিশন গোষ্ঠীতে ফেলিক্স কেরীর অনুজ কর্মী রেভাবেণ্ড ডক্টর জোশুয়া মার্শম্যানের সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র জনের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সহিত সম্পর্কের কাহিনী শুনাইতে বসিয়াছি। জনের কীর্তি-কথা লিখিত না হইলে মহাত্মা উইলিয়ম কেরী-প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুর ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনের এবং তৎপ্রবর্তিত বাংলা গদ্যের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ফেলিক্স কেরী উইলিয়ম কেরীর আত্মজ হইলেও তাঁহার প্রকৃতি পিতৃ-অনুসারী ছিল না। পিতা ছিলেন সদা পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী, ধর্মনিষ্ঠ কর্মী পুরুষ, পুত্রের স্বভাব ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি ছিলেন খামখেয়ালী কবি। উচ্ছৃঙ্খলতা, উদাসীনতা ও ভোগলিপ্সার মধ্যেই তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা বিস্ময়কর। জন ক্লার্ক মার্শম্যানই ছিলেন উইলিয়ম কেরীর যথার্থ মানসপুত্র; কর্মযোগী কেরীর উপযুক্ত উত্তরাধিকারী। তৎকৃত কর্ম ও কীর্তিসম্ভারের বিপুলতা সত্ত্বেও তদনুপাতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই। ইহার প্রধান কারণ, অন্তরালবর্তী থাকিয়া কর্মানুষ্ঠানের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। তিন-তিনখানি পত্র-পত্রিকার সহিত সম্পাদক হিসাবে তাঁহার নাম যুক্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি কদাচিৎ আত্মপ্রচার করিয়াছেন। শ্রীরামপুর ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনের অপর কর্মী ও সাধকদের সম্বন্ধে তিনি বিস্তর লিখিয়াছেন বলিয়াই আমরা তাঁহাদের সম্যক্ পরিচয় অবগত হইয়াছি। তাঁহার সম্বন্ধে লিখিবার লোক, তিনি ভারতবর্ষে অবস্থানকালে বিশেষ কেহ ছিলেন না। গ্রন্থাকারে তাঁহার কোনও বিস্তৃত জীবনী এতাবৎ কালও প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর (৮ জুলাই, ১৮৭৭) পর 'জার্নাল অব দি রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি', 'টাইমস্', 'ইলাস্ট্রেটেড লণ্ডন নিউজ', 'অ্যানুয়াল রেজিস্ট্রার', 'ল টাইমস্' প্রভৃতি সাময়িক পত্রের শোকসংবাদে[১] তাঁহার যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশিত হয়, তাহা যথেষ্ট নয়। অবশ্য

---

১ 'ডিক্‌শনারী অব ন্যাশনাল বায়োগ্রাফি'তে "জি. সি. বি." প্রদত্ত তালিকা এই :

"Times, 10 July 1877, p. 4; Illustrated London News, 28 July 1877, p. 98, with portrait; Journal of the Royal Asiatic Society. 1878, 8 vo, vol. x. Annual Report pp xi-xii.; Hunter's Gazetteer of India., article "Serampur"; Annual Register, 1877, p. 154; Law Times, 1877, LXIII. 201."

সুবিখ্যাত 'ডি. এন. বি.' বা 'ডিক্‌সনারী অব ন্যাশনাল বায়োগ্রাফি' তাঁহাকে এক "কলম" স্থান দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন; জে. জে. হিগিনবোথামের 'মেন হুম ইণ্ডিয়া হাজ নোন' গ্রন্থের ১৮৭৮ সনে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের "সাপ্লিমেণ্ট" খণ্ডের ৫৮-৫৯ পৃষ্ঠায় 'ডি. এন. বি.'তে প্রকাশিত 'জি সি. বি.'র লেখাটিই সামান্য অদল-বদল করিয়া মুদ্রিত[২] হইয়াছে; সি. ই. বাকল্যাণ্ডও তাঁহার 'ডিক্‌সনারী অব ইণ্ডিয়ান বায়োগ্রাফি'তে (১৯০৬) জন ক্লার্ক মার্শম্যানকে (পৃঃ ২৭৬) আধ "কলমের"ও একটু বেশি স্থান দিয়াছেন। পরবর্তী কালে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে তাঁহার 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গলি লিটারেচার' (১৯১৯) গ্রন্থের ২৪৫-২৪৯ পৃষ্ঠায় জনের বাংলা বইগুলির বিস্তৃত তালিকা দেওয়ার প্রয়াস করিয়াছেন। এই বইখানি ছাড়া অন্য কুত্রাপি বাংলা-সাহিত্যে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের দান সম্বন্ধে আলোচনা হয় নাই। উনিশ শতকের ও বর্তমান কালের অন্যান্য বাংলা গদ্য সাহিত্য-বিষয়ক গ্রন্থে জন মার্শম্যান সম্বন্ধে এত সামান্য আলোচনা আছে যে তাহা উল্লেখযোগ্য নয়।

আশ্চর্যের বিষয়, জন ক্লার্ক মার্শম্যান স্বয়ং ইংরেজীতে দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ বৃহৎ 'দি লাইফ অ্যাণ্ড টাইমস অব কেরী, মার্শম্যান অ্যাণ্ড ওয়ার্ড' (১৮৫৯) গ্রন্থে অনেক সুযোগ সত্ত্বেও নিজেকে জাহির করেন নাই। ইহার প্রতিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন কেরী-বংশের এস. পিয়ার্স কেরী ১৯২৩ সনে লণ্ডনের হডার অ্যাণ্ড স্টটন লিমিটেড প্রকাশিত জীবনীগ্রন্থ 'উইলিয়ম কেরী'তে। ১৯৩৪ সনে লণ্ডনের দি কেরী প্রেস-প্রকাশিত পরিবর্ধিত অষ্টম সংস্করণে আমরা দেখিতেছি, জন ক্লার্ক মার্শম্যান অনেকখানি স্থান পাইয়াছেন। এখন পর্যন্ত তাঁহাকে সর্বাধিক সম্মান দেখাইয়াছেন তাঁহার বন্ধু ও সহকর্মী, 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র পরবর্তী সম্পাদক[৩] জর্জ স্মিথ। তাঁহার 'টুয়েলভ ইণ্ডিয়ান স্টেটসমেন' (১৮৯৭) গ্রন্থের কুড়ি পৃষ্ঠাব্যাপী নবম অধ্যায়ে তিনি জন ক্লার্ক মার্শম্যানের জীবন, চরিত্র ও কীর্তি অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জন মার্শম্যানের কর্মবহুল জীবনের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সহিত সম্পর্কিত, উপরোক্ত রচনাগুলিতে অবহেলিত, অংশটুকুই এই অধ্যায়ে বিবৃত হইল।

জীবনী

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই আগস্ট তারিখে ইংলণ্ডের ব্রিস্টলের অন্তঃপাতী ব্রড্‌মিডে স্থানীয় ছোট একটি স্কুলের সদ্যভারপ্রাপ্ত শিক্ষক জোশুয়া মার্শম্যানের জ্যেষ্ঠ পুত্র জন ক্লার্কের জন্ম

এতদ্‌ব্যতীত, লুই জেনিংস এম. পি. সম্পাদিত 'দি নিউইয়র্ক টাইম্‌স'-এর ১৮৭৭ সনের জুলাই সংখ্যায় জন ক্লার্ক মার্শম্যানের তিরোধান সম্পর্কে তাঁহার জীবনীসম্বলিত একটি সুন্দর নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।

২ G. C. B.-ই Higginbootham-এর উপকরণ ব্যবহার করিয়াছেন।

৩ জন ক্লার্ক মার্শম্যান—১৮৩৫ সনের ১লা জানুয়ারি সাপ্তাহিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' প্রতিষ্ঠা করিয়া ১৮৫২ পর্যন্ত ১৭ বৎসর ইহার সম্পাদনা করেন; পরবর্তী সম্পাদক জনের ভাগিনের মেরিডিথ টাউনসেণ্ড ১৮৫২ হইতে ১৮৫৯ সন পর্যন্ত এবং তাঁহার পরেই জর্জ স্মিথ ১৮৫৯ হইতে ১৮৭৫ সন পর্যন্ত সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

হয়। মাতা হানা আদর্শ সহধর্মিণী ও লক্ষ্মীস্বরূপিণী গৃহিণী ছিলেন। পূর্ব-ভারতবর্ষের 'ধর্মহীন অজ্ঞান' মানুষদের মধ্যে ধর্ম ও জ্ঞান বিতরণের সদুদ্দেশ্য লইয়া, কেট্‌রিঙের ব্যাপ্‌টিস্ট মিশন মণ্ডলীভুক্ত হইয়া ১৭৯৯ সনের শেষ ভাগে সস্ত্রীক সপুত্র জোশুয়া মার্শম্যান পূর্বসূরি উইলিয়ম কেরীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন উইলিয়ম ওয়ার্ড প্রমুখ তিন জন মিশনরি। জাহাজ কলিকাতা পৌঁছিলে নেপোলিয়ান বোনাপার্টের চর সন্দেহে তাঁহাদিগকে কলিকাতার মাটিতে পদার্পণ করিতে দেওয়া হয় না। তাঁহারা ১৩ই অক্টোবর তারিখে ডেনিশ উপনিবেশ শ্রীরামপুরে অবতরণ করেন। বালক জনের বয়স সে দিন পাঁচ বৎসর দুই মাস পূর্ণ হইতে পাঁচ দিন বাকি ছিল। উইলিয়ম কেরী অচিরাৎ মালদহের বৈষয়িক ও ঐশ্বরিক সর্ববিধ কার্য পরিত্যাগ করিয়া নবাগত ধর্মভ্রাতৃগণের সহিত শ্রীরামপুরে মিলিত হন এবং শ্রীরামপুর ব্যাপ্‌টিস্ট মিশন ও ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা ও ভারতের, তথা পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য ভাষায় ধর্মগ্রন্থ বাইবেল প্রকাশের আয়োজন আরম্ভ হয় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের সূত্রপাত হইতেই। সুবিখ্যাত কেরী মার্শম্যান ওয়ার্ডের কীর্তির আরম্ভও এইখানেই। জনেরও শিক্ষারম্ভ শ্রীরামপুরে, এই ত্রয়ীর কাছে। উইলিয়ম কেরী ও পিতা জোশুয়া মার্শম্যানের পাণ্ডিত্য, উইলিয়ম ওয়ার্ডের পরিচ্ছন্ন শৃঙ্খলাবোধ এবং আট বছরের অগ্রজ ফেলিক্স কেরীর বাংলাভাষা-জ্ঞান বালক জনকে ধীরে ধীরে শিক্ষিত ও মিশনের কাজের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে থাকে। সেই সঙ্গে মাতা হানার ধর্মবিশ্বাস ও মিশনের কাজে আত্মত্যাগের আদর্শ জনকে একজন দৃঢ়চেতা, কর্মনিষ্ঠ, ত্যাগী মানুষের মত মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলে। হানার সম্বন্ধে জর্জ স্মিথ লিখিয়াছেন: "আধুনিক কালের প্রথম নারী-মিশনরির জীবনী এখনও লিখিত হইবার অপেক্ষায় আছে। তাঁহার দীর্ঘ ভারতীয় জীবনের আটচল্লিশ বৎসরের প্রায় প্রত্যেক দিবসটিই তিনি বাংলা দেশের বালিকা ও নারীদিগকে খ্রীষ্টীয় আদর্শে ভাল ও শিক্ষিত করিবার কাজে ব্যয়িত করিয়া গিয়াছেন। তিনি শ্রীরামপুর ভ্রাতৃসংঘকে বরাবর সেই গার্হস্থ্য আরাম ও শান্তি যোগাইয়াছেন, যাহার অভাব ঘটিলে এই কর্মব্যস্ত মানুষেরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহার অর্ধেকও সম্পাদন করিতে পারিতেন না।"

১৮১২ সনে মাত্র সতের বৎসর বয়সেই জন পূরাপূরি মিশনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮১৯ সনে তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে মিশন-ভ্রাতৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হন। তৎপূর্বেই ১৮১৮ সনের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে উইলিয়ম ওয়ার্ড স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারকল্পে ইংলণ্ড যাত্রা করিলে মিশনের ছাপাখানার তত্ত্বাবধান ও বৈষয়িক কার্য-পরিচালনার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়।[৪] ইংরেজী ও ভারতীয় বিবিধ ভাষায় প্রভূত জ্ঞান সত্ত্বেও ১৮২২ সনের গোড়ায় ইউরোপীয় ক্লাসিকস্‌ বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞান লাভ করিবার জন্য তিনি ইটালি ও গ্রীস যাত্রা করেন। ১৮২৩ সনের ৭ই মার্চ শ্রীরামপুরে কলেরা রোগে উইলিয়ম ওয়ার্ডের অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটায়

৪ বয়সে অগ্রজ বিক্ষিপ্তচিত্ত ফেলিক্স ১৮১৮ সনের গোড়ায় আরাকানের অরণ্য হইতে ওয়ার্ড কর্তৃক শ্রীরামপুরে নীত হওয়ার পর আপনাকে অন্তরালে রাখিতেই ভালবাসিতেন।

উইলিয়ম কেরী জনকে শ্রীরামপুর প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসেন। সে দিন হইতে ১৮৫২ সনে ভারতবর্ষের কাছে চিরবিদায় লইয়া স্বদেশযাত্রা পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল তিনি ভারতবর্ষে বিচিত্র কর্মময় জীবন যাপন করেন।

তন্মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য :

১. প্রবর্তক-ত্রয়ী কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের বার্ধক্য ও স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু 'সমাচার দর্পণ' ও 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদন ও পরিচালনভার সম্পূর্ণ গ্রহণ। এই কার্যে নবাগত (১৮২১) জন ম্যাক তাঁহার বিশেষ সহায়তা করেন।

২. ১৮১৮ সনে তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুর মিশনরি কলেজের পরিচালন ও আর্থিক দায়িত্বভার সম্পূর্ণ গ্রহণ।

৩. শ্রীরামপুরে ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম কাগজের কল স্থাপন ও পরিচালন।

৪. ১৮৪০ সনের ১লা জুলাই হইতে নবপ্রতিষ্ঠিত 'গবর্ণমেণ্ট গেজেট' নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদন-ভার গ্রহণ ও ১৮৫২ সনে বিলাতযাত্রা পর্যন্ত উক্ত পত্র পরিচালন।

৫. ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন।

৬. ইংরেজী ও বাংলায় সরকারী আইন সঙ্কলন।

৭. সুন্দরবন অঞ্চলে খ্রীষ্টীয়ান উপনিবেশ স্থাপনের প্রচেষ্টা। এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

৮. উইলিয়ম কেরীর পরে সরকারের বাংলা অনুবাদকের পদ গ্রহণ।

১৮১৫ সনের এপ্রিল মাসে যুবক উইলিয়ম ইয়েটস্ সদ্য বিলাত হইতে আসিয়া শ্রীরামপুরের মিশন-গোষ্ঠীভুক্ত হন; ১৮১৭ সনের ২৫ আগস্ট আসেন মূল ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্যামুয়েল পীয়ার্সের পুত্র উইলিয়ম পীয়ার্স। কেরীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জীবনীকার ইউস্টেস কেরীর সহিত মিলিত হইয়া ১৮১৭ সনেই ইঁহারা প্রতিষ্ঠাতাত্রয়ী, বিশেষ করিয়া জোশুয়া মার্শম্যানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং বিলাতের কমিটির সমর্থনে ১৮১৮ সনের গোড়ায় শ্রীরামপুর ছাড়িয়া কলিকাতার এণ্টালি অঞ্চলে স্বতন্ত্র ব্যাপ্‌টিস্ট মিশন স্থাপন করেন। বিলাতের এবং শ্রীরামপুরের মিশন-গোষ্ঠীর মধ্যে ঘোরতর অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। কলহের প্রধান কারণ, শ্রীরামপুর-ত্রয়ীর ব্যক্তিগত আয় ও সম্পত্তি লইয়া। ত্রয়ীর নানামুখী উপার্জনে এবং বন্ধু ও ভক্তজনের দানে শ্রীরামপুর সোসাইটির সম্পত্তি বিপুলায়তন হইয়া উঠিয়াছিল। তরুণ বিদ্রোহীরা এই সম্পত্তিকে মূল ব্যাপ্‌টিস্ট সমিতির সম্পত্তিরূপে গণ্য করিতে চাহিতেছিলেন। অপরের অর্জিত বিষয়-সম্পত্তি সম্পর্কে এই অন্যায় দাবী ত্রয়ী সমর্থন করিলেন না। তাঁহাদের অবর্তমানে এই সম্পত্তির উত্তরাধিকার কাহাতে বর্তিবে, এই প্রশ্ন উঠে। ত্রয়ী জন ক্লার্ক মার্শম্যানের কর্মক্ষমতার উপর আস্থা জ্ঞাপন করেন। বিদ্রোহীরা মার্শম্যান-গোষ্ঠী-বিরোধী। এই কলহের তুষানল দীর্ঘ বার বৎসর ধিকিধিকি জ্বলিয়া ১৮৩০ সনে নির্বাপিত হয়। উইলিয়ম কেরীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠাতাত্রয়ী বিলাতের

মূল সমিতি-নিয়োজিত ট্রাষ্টিদের হাতে সমস্ত সম্পত্তি নির্ব্যূঢ় স্বত্বে তুলিয়া দেন। এই প্রসঙ্গে জন ক্লার্ক মার্শম্যান লেখেন, "সম্পত্তির অধিকার অর্জনে কোনও মানুষকে অধিক আনন্দ প্রকাশ করিতে দেখা যায় নাই—সম্পত্তি বর্জন করিয়া এই প্রবীণেরা যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

কর্মবীর জন ক্লার্ক শেষ পর্যন্ত প্রবীণ ত্রয়ীর মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন স্বোপার্জিত অর্থে সমিতির অক্ষম ট্রাষ্টিদের নিকট হইতে এই সম্পত্তি পুনঃ ক্রয় করিয়া। জর্জ স্মিথ লিখিয়াছেন :

> "...and it fell to him [J. C. M.] to buy back, out of his own earnings, the mission property, which they had created and surrendered with almost quixotic generosity. Before his death he made over the famous college and the properties, thus twice his own, to a new generation of the society, and all with a quiet, albeit righteously proud, reticence, which concealed the nobility of his action. Left sole representative of the Brotherhood and undertaking its enormous responsibilities, John Clark Marshman created the income necessary to meet them by his literary labours—his paper mill, the first in India; his educational and law text books and his official salary as Government translator. In all this he became an expert oriental scholar, mastering Chinese like his father, as well as Sanskrit and Persian. The Bengali language and literature he followed Carey in almost creating, his knowledge and style surpassing that of the Bengalis themselves, with two exceptions."

অর্থাৎ "যে মিশন সম্পত্তি তাঁহারা [কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ড] অর্জন ও প্রায়-উন্মাদ-উদারতায় বর্জন করিয়াছিলেন, স্বোপার্জিত অর্থে তাহা পুনঃক্রয়ের দায়িত্ব তাঁহার [জন ক্লার্ক মার্শম্যান] উপর পড়ে। এবং তিনি মৃত্যুর পূর্বে এই প্রসিদ্ধ কলেজ ও সমস্ত সম্পত্তি, যাহা দুই-দুই বার এই ভাবে তাঁহার নিজস্ব হয়, পরবর্তী নূতন বংশধরদের দ্বারা স্থাপিত সমিতির হস্তে ন্যস্ত করেন। তাঁহার এই নীরব সংযত দানের অন্তরালে হয় ত সঙ্গতভাবেই তাঁহার গর্বিত মনোভাব একটু ছিল, কিন্তু তাঁহার কার্যের মহত্ত্বও সেই সঙ্গে গোপন ছিল। ভ্রাতৃগোষ্ঠীর একমাত্র প্রতিনিধি হইয়া এবং তাঁহাদের বিপুল দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া জন ক্লার্ক মার্শম্যান প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জন করিতেন—তাঁহার সাহিত্যকর্ম, তাঁহার কাগজ-কল—যাহা ভারতে প্রথম কাগজ-কল, তাঁহার স্কুল-কলেজ-পাঠ্য ও আইন পুস্তকাবলী এবং গবর্ণমেণ্ট অনুবাদক হিসাবে তাঁহার সরকারী বেতনের দ্বারা। এই কর্মযোগে তিনি প্রাচ্য-পাণ্ডিত্যে দক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহার পিতার মত চীনাভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সংস্কৃত ও পারস্য ভাষাতেও কম দক্ষতা অর্জন করেন নাই। উইলিয়ম কেরীর মত তাঁহাকেও বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের একজন স্রষ্টা বলা চলে। এই বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান ও তাঁহার রচনারীতি মাত্র দুই জন ছাড়া সকল বাঙালীকে অতিক্রম করিয়াছিল।"

জর্জ স্মিথ সম্ভবতঃ মৃত্যুঞ্জয় ও রামমোহনের কথা ভাবিয়াছিলেন। প্রসঙ্গত ইহা বলাও প্রয়োজন যে, জনের উৎসর্গীকৃত কলেজ আজ পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইয়া তাঁহার মর্যাদা বৃদ্ধি করিতেছে। মূল সমিতির সহিত এই বিচ্ছেদের পর জন প্রকাশ্যতঃ

ধর্মপ্রচারকের কাজে ইস্তফা দিয়া বৈষয়িক কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। অবশ্য ইহার পরেও ভারতে খ্রীষ্টমহিমা প্রচারের কোনও সুযোগই তিনি ত্যাগ করেন নাই। শ্রীরামপুরের অসহায় মিশন-গোষ্ঠীকে প্রতিপালন করিবার জন্যই তাঁহাকে পারমার্থিক জীবন ত্যাগ করিয়া আর্থিক জীবন যাপন করিতে হয়। এই সময়ে তিনি প্রচুর উপার্জন করিলেও নিজে মাসিক মাত্র দুই শত টাকা ব্যয় করিয়া, বাকি সমস্ত টাকা কলেজ ও শ্রীরামপুর সমিতির জন্য দান করিতেন। ভারতবর্ষীয়দের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলাই শেষ পর্যন্ত তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়। তিনি পরবর্তী জীবনে বারংবার ঘোষণা করিয়াছেন—"Education must in India precede Christianity."—"ভারতকে খ্রীষ্টধর্ম দেওয়ার পূর্বে জ্ঞান দান করিতে হইবে।" তিনি নিজে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মৃত্যু পর্যন্ত তজ্জন্যই প্রাণপাত করেন।

অনুবাদক ও 'গবর্ণমেণ্ট গেজেটে'র সম্পাদক হিসাবে সরকারের সহিত যুক্ত হওয়াতে ভারতবর্ষে অবস্থানের শেষ কয়েক বৎসর (১৮৪০—১৮৫২) জনকে সাময়িক পত্র-পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে নানাভাবে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। 'সরকারের দালাল' তাঁহার নামের বিশেষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শ্রীরামপুর কলেজের ও মিশনের কর্তৃত্বভার ত্যাগ করিয়া তিনি ভারতবর্ষে সুখী ছিলেন না, তদুপরি এই নিন্দা কুৎসায় তিক্তবিরক্ত হইয়া ১৮৫২ সনে তিনি পিতা ও পিতৃবন্ধুদের স্বেচ্ছানির্বাচিত স্বদেশ এবং নিজের তিপ্পান্ন বৎসরের কর্মস্থল ভারতবর্ষ চিরতরে ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সেখানে জীবনের শেষ পাদ তিনি ভারতবর্ষের কল্যাণেই ব্যয়িত করেন। ভারতবাসীর শিক্ষা, কৃষি ও বনসম্পদ্‌, টেলিগ্রাফ ও রেলওয়ের উন্নতি বিধান এই কালে তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্বদেশে তিনি কীর্তির উপযুক্ত (সামান্য সি. এস. আই. উপাধি ছাড়া) সম্মান লাভ করেন নাই। বারংবার ভারতের কল্যাণ সাধনোদ্দেশ্যে পার্লামেণ্টের সভ্যপদপ্রার্থী হইয়া তিনি কৃতকার্য হন নাই, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলেও তাঁহার স্থান হয় নাই। ভারতীয় রেলওয়ের হিসাব-বিভাগের একজন কর্মী হিসাবেই তিনি প্রিয় ভারতবর্ষের সহিত শেষ প্রত্যক্ষ যোগ রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার বিখ্যাত ইংরেজী গ্রন্থ (সবগুলিই ভারত সংক্রান্ত) ও পুস্তিকাগুলি এই কালেই রচিত ও প্রকাশিত হয়।[৫] তালিকা রচনাপঞ্জীতে দ্রষ্টব্য।

---

৫ "In England, however, he was not recognised; he failed after four sharp contests, in entering Parliament; Sir Charles Wood, unaware of his special official merit, his great capacity for managing the details of finance, refused him a seat in the Indian Council, and though his services to education were, at the instigation of Lord Lawrence, tardily recognised by the Companionship of the Star of India [1868] he was compelled to occupy himself in the affairs of the East India Railway, where, as chairman of the committee of audit, he rendered most efficient, but of course unrecognised service, and in writing books like his 'History of India' and the 'Lives of Carey, Marshman and Ward.'—"Supplement to 'Men whom India has known,' 1878, p. 59.

জে. জে. হিগিনবোথাম জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সংক্ষিপ্ত জীবনী এই বলিয়া শেষ করিয়াছেন :

"To the last he remained always an Indian, caring principally for the fortunes of the great empire he had helped to guide, and lending the aid of his apparently endless knowledge to anyone who consulted him, and who knew enough to know when he was obtaining fresh material. He was finishing, when he died, a complete series of biographies of the Viceroys, a work which will now scarcely appear. He rarely spoke of his fixed ideas, however, turning them over in his mind for himself, just as in earlier years he had turned over and concealed his knowledge, till of all who knew Mr. Marshman, probably not three were aware that he had given years to Chinese, that he had read intelligently all the great Sanscrit poems, and that he once knew Persian as thoroughly as most diplomatists know French."

অর্থাৎ, "জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেকে সর্বদা একজন ভারতীয় বলিয়াই জ্ঞান করিতেন ; যে মহান্ সাম্রাজ্যের তিনি পথপ্রদর্শক ছিলেন, তাহারই কল্যাণ তাঁহার প্রধান কাম্য ছিল ; যে কোনও জিজ্ঞাসু, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোনও বিষয়ের যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য অবগত হইয়া তাঁহার কাছে নূতন উপকরণের সন্ধানে যাইত, তিনি তখনই তাহার নিকট তাঁহার অসীম জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া তাহাকে সাহায্য করিতেন। ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধিদের সম্পূর্ণ চরিতমালা রচনা তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ করিবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু ঘটায় তাহা প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হইয়াছে। তিনি শেষ জীবনে নিজের দৃঢ় মতামতের কথা কদাচিৎ প্রকাশ্যতঃ বলিতেন, নিজের মনে মনেই সেগুলি সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করিতেন। এই অভ্যাস তাঁহার প্রথম জীবনের। তখন যে জ্ঞান তিনি অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা মনে মনেই রাখিতেন। তাঁহার মন্ত্রগুপ্তি এমনই নিখুঁত ছিল যে, তাঁহার পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে মাত্র দুই তিন জনই জানিতেন যে, তিনি কয়েক বৎসরের চেষ্টায় চীনা ভাষা শিখিয়াছেন, সংস্কৃত মহাকাব্যসমূহ পড়িয়া বুঝিয়াছেন এবং পররাষ্ট্রবিদ্‌দের ফরাসী ভাষায় যেরূপ দক্ষতা অর্জন করিতে হয়, পারসিক ভাষায় সেইরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন।"

তাঁহার এই মন্ত্রগুপ্তির আর একটি প্রমাণ এই যে, শ্রীরামপুর কলেজের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতিকল্পে তিনি এককালীন ও মাসে মাসে (সরকারী অনুবাদকের মাসিক এক হাজার টাকা বেতনের সবটাই) যাহা দান করিয়াছিলেন, তাহার পরিমাণ যে কয়েক লক্ষ টাকা, তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পরমাত্মীয়েরাই সে কথা প্রথম অবগত হইয়া বিস্ময়বোধ করেন।

তিরাশী বৎসরের পরিপূর্ণ জীবন যাপন করিয়া ১৮৭৭ সনের ৮ই জুলাই তারিখে লণ্ডনের কেনসিংটন পল্লীতে, রেডক্লিফ স্কোয়ার নর্থে ভারতবন্ধু এই কর্মী পুরুষের মৃত্যু হয়।

রচনাপঞ্জী

ইংরেজী

জন মার্শম্যান সব্যসাচী ; ইংরেজী ও বাংলায় ডাইনে-বাঁয়ে লিখিতে পারিতেন। বাংলা সাহিত্য ও ভাষার সহিত তাঁহার সম্পর্ক তাঁহার ইংরেজী রচনার সহিতও অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত বলিয়া জীবৎকালে প্রকাশিত তাঁহার ইংরেজী পুস্তক ও পুস্তিকাগুলির কালানুক্রমিক তালিকা সর্বাগ্রে দিতেছি :

1. Reply of J. C. Marshman to the Attack of J. S. Buckingham on the Serampore Missionaries, 1826.
2. Guide book for Moonsiffs, Sudder Ameens and Principal Sudder Ameens, containing all the Rules necessary for the conduct of suits in their Courts, 1832.
3. Guide to Revenue Regulations of the Presidencies of Bengal and Agra. 2 vols, Serampore, 1835.
4. Outline of the History of Bengal, 1840 (?), 5th Edn. 1844.
5. The History of India from Remote Antiquity to the Accession of the Mogul Dynasty, 1842.

'এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা'য় জনের মাত্র এই ইতিহাসখানির উল্লেখ আছে।

6. A Guide to the Civil Law of the Presidency of Fort William containing all the unrepealed Regulations, Acts, Constructions and Circular Orders of Government. To which is prefixed an epitome of every Enactment and Rule, corrected to the 31st December 1841, Serampore, 1842. Pp. XLIII, 540.

জে. জে. মূর ১৮৪৫-৪৬ সনে দুই খণ্ডে ইহার উর্দ্দু অনুবাদ প্রকাশ করেন।

'এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা' একাদশ সংস্করণ, ভ্যলুম ১৭, পৃঃ ৭৭৪-এ বলা হইয়াছে—"*Guide to the Civil Law* which before the work of Macaulay was the Civil Code of India."

7. The Darogah's Manual, comprising also the duties of Landholders in connection with the Police. Serampore, 1850. Pp. XX 328
8. How wars arise in India. Observations on Mr. Cobden's Pamphlet entitled 'The Origin of the Burmese War.' H. Allen & Co., London, 1853. Pp. 71.
9. Letter to John Bright, Esq. M. P. relating to the recent debates in Parliament on the India Question, H. Allen & Co., London, 1853. Pp. 53.

10. The Life and Times of Carey, Marshman, and Ward. Embracing the History of the Serampore Mission. 2 vols. Pp. 511+527,...Longmans..., London, 1859.
11. Memoirs of Major-General Sir Henry Havelock, K. C. B. Pp. 462, London, 1860.
12. The History of India from the Earliest Period to the close of the Eighteenth Century. Part 1, 1863.
13. The History of India from the Earliest Period to the close of Lord Dalhousie's Administration. 3 vols, London, 1867.
14. Abridgement of the History of India—from the earliest period to the close of the East India Company's Govt, Pp. 544, Serampore, 1873.
15. History of India from the eartiest period to the close of the E. I. Company's Government. Abridgement from the Author's larger work, London and Edinburgh. 1876.

এতদব্যতীত কয়েকটি খ্রীষ্টধর্মপ্রচারমূলক পুস্তিকাও জন ক্লার্ক মার্শম্যান রচনা করিয়াছিলেন। মার্ডকের তালিকায় ('Catalogue of the Christian Vernacular Literature of India···' by John Murdoch, 1870) ইংরেজী বাংলায় প্রচারিত পুস্তিকার নাম আছে, যথা 'Jagannath' by G. C. M. ৮ পৃষ্ঠা ১৮২৯।

এই তালিকায় (২) ও (৩) এর মাঝখানে আর একটি বই বসিবে যাহাকে একটু স্বতন্ত্র করিতে হইতেছে। ইহা ইংরেজী ও বাংলা দুই ভাষায় লিখিত। বইখানির নাম :

16. Brief Survey of History (পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ) Pt I. from the creation to the beginning of the Christian Era. Translated by J. C. Marshman, English & Bengali. Pp. 6+513. Serampore 1833.

তাঁহার ইংরেজী আইন বইগুলি (2, 3, 6, 7) বিশেষ করিয়া 'গাইড টু সিভিল ল···' ও 'দারোগাজ ম্যানুয়েল' বহুল প্রচারিত হইয়াছিল। এই গুলির বঙ্গানুবাদও তিনি স্বয়ং করিয়াছিলেন। হিগিনবোথাম বলিয়াছেন :

"[He] published a series of law books, one of which the 'Guide to the Civil Law' was for many years the Civil Code of India, and was probably the most profitable law book ever published."

4 নং বই "Outline of the History of Bengal' সম্বন্ধে 'ডিকশনারী অব ন্যাশনাল বায়োগ্রাফি'তে লেখা হইয়াছে : "the first, and for years the only history of Bengal." এই বিশেষণ অতিরঞ্জিত। কারণ, কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের (১৮০০-১৮০৬) ও ইংলণ্ডের হেলিবেরি কলেজের (১৮০৭-১৮২৭) পার্সিয়ান ভাষার অধ্যাপক চার্লস

স্টুয়ার্ট (Charles Stewart, 1761-1837) ১৮১৩ সনে তাঁহার সুবিখ্যাত 'দি হিস্ট্রি অব বেঙ্গল ফ্রম দি ফার্স্ট মাহামাডান ইনভেশন আনটিল ১৭৫৭' প্রকাশ করেন। স্টুয়ার্টের বাংলার ইতিহাসও কম প্রসিদ্ধ নয়। তবে মার্শম্যানের বাংলার ইতিহাসকে অনুবাদ ও অনুসরণের দ্বারা বাংলা দেশের যাবতীয় বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে প্রচার করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, গোবিন্দচন্দ্র সেন, রেভারেণ্ড ডক্টর জন ওয়েঙ্গার প্রভৃতি আরও অনেকে ইহার খ্যাতি সমধিক বৃদ্ধি করেন। উল্লেখযোগ্য তিনখানি অনুবাদ এই :

১। বাঙ্গালার ইতিহাস। [জে, সি, মার্শম্যানের ইংরাজী হইতে অনূদিত]
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সেন। পৃষ্ঠা ৩৩৭। কলিকাতা ১৮৪০।

ইহাতে ১২০৩ সনে বঙ্গদেশে মুসলমান আক্রমণ হইতে ১৮৩৫ সন পর্যন্ত ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে। ১৮৩৯ সনে সাধারণ জ্ঞানোপাজিকা সভার অধিবেশনে গোবিন্দচন্দ্র মার্শম্যান অবলম্বনে ভারতবর্ষের ও বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেন, তাহা ৩২ পৃষ্ঠার এক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

আমরা ১৮৪০ সনের ৭ই মার্চের 'সমাচার দর্পণে' 'জ্ঞানান্বেষণ' হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত সংবাদটি পাইতেছি : "আমরা শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেনের কৃত মার্সমান সাহেবের বঙ্গদেশীয় ইতিহাসের অনুবাদগ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম। অস্মদ্দেশীয় ভাষায় অস্মদ্দেশীয় ইতিহাস এই প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ হইল । [জ্ঞানান্বেষণ]"

লং সাহেব গোবিন্দচন্দ্রের ভাষার দুরূহতার নিন্দা করিয়াছেন।

২। বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ।
সিরাজ উদ্দৌলার সিংহাসনারোহণ অবধি লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের অধিকার পর্যন্ত।
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংকলিত। পৃঃ ২ + ১৪৪, কলিকাতা [সং ১৯০৪] ১৮৪৮।

"বিজ্ঞাপন" :—"বাঙ্গালার ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগ শ্রীযুক্ত মার্শমন সাহেবের রচিত ইঙ্গরেজী গ্রন্থের শেষ নয় অধ্যায় অবলম্বন পূর্বক সঙ্কলিত, ঐ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। কোনও কোনও অংশ অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং কোনও কোনও বিষয় আবশ্যকবোধে গ্রন্থান্তর হইতে সঙ্কলন পূর্বক সন্নিবেশিত হইয়াছে।...শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা।"

ফলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' এমনই নূতনত্বসম্পন্ন হইয়া উঠে যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের তদানীন্তন সম্পাদক ও পরীক্ষক মেজর জি. টি. মার্শাল মার্শম্যানের ইতিহাসের বিদ্যাসাগরকৃত অনুবাদের আক্ষরিক ইংরেজী অনুবাদ করিয়া স্বয়ং মার্শম্যানের সমর্থনে 'এ গাইড টু বেঙ্গল' টীকাটিপ্পনী সহ রচনা করেন। বঙ্গীয় সরকার ১৮৫০ সনে এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

৩। বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত। শ্রীযুক্ত মার্শমান সাহেবের রচিত গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত। পৃ ২৮৪, কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত ১৮৫৩।

জন ওয়েঙ্গার এই অনুবাদ করিয়াছেন।

মার্শম্যানের ভারতবর্ষের ইংরেজী ইতিহাস অবলম্বনে গোবিন্দচন্দ্র সেন, গোপাললাল

মিত্র, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিও বিবিধ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

১। ভারতবর্ষের ইতিহাস [জন ক্লার্ক মার্শম্যানের 'হিস্টরি অব ইণ্ডিয়া' হইতে অনূদিত] শ্রীগোপাললাল মিত্র। পৃ ৮+২০১+১১, কলিকাতা ১৮৪০।

এইচ. এস. জারেট (মেজর) ১৮৮০ সনে মার্শম্যানের হিন্দুরাজত্ব অংশ হিন্দুস্থানী অনুবাদে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

16 নং পুস্তক 'Brief Survey of History'র পরবর্তী ইতিহাস কৌতূহলোদ্দীপক। মার্শম্যানের নিজকৃত বঙ্গানুবাদ সত্ত্বেও প্রখ্যাত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের অগ্রজ রামকমল ভট্টাচার্যের নির্দেশে কলিকাতা "সংস্কৃত-বিদ্যালয়ের কতিপয় সুশিক্ষিত ছাত্র…মার্শম্যান-বিরচিত 'ব্রিফ সার্ভে অব হিষ্ট্রি' নামক ইংরেজী পুস্তক যথাক্ষর অনুবাদ" করেন। ১৮৬২ সনে এই গ্রন্থ "ইতিবৃত্তসার। ১ম ভাগ। সৃষ্টি অবধি খ্রীষ্টিয় শকের প্রারম্ভ পর্যন্ত। মার্শম্যান বিরচিত 'ব্রিফ সার্ভে অব হিষ্ট্রি'র অনুবাদ।" এই নামে কলিকাতা গৌড়ীয় প্রেস হইতে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩৩৫।

10 সংখ্যক গ্রন্থ 'The Life and Times of Carey, Marshman, and Ward" ১৮৮০ সনে মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী কর্তৃক সংক্ষেপে বাংলায় রূপান্তরিত হইয়া 'আদর্শচরিত, কিম্বা কেরি, ওয়ার্ড, এবং মার্শম্যান চরিত।' নামে কলিকাতা ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস হইতে বাহির হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৫৩।

মার্শম্যান সাব জন উইলিয়ম কে (Kaye) প্রতিষ্ঠিত (১৮৪৪) 'দি ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রের প্রথম পনের ভ্যালুমে (সাড়ে সাত বৎসর) ভারত ও বঙ্গদেশ সম্পর্কিত দশটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধগুলি সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে আমাদের যথেষ্ট উপকার হইবে। প্রবন্ধগুলির তালিকা এখানে প্রকাশ করিলাম।

	Vol.	No.	
1.	I.	2	Lord William Bentinck's Administration.
2.	II.	3	Sir W. H. Macnaghten.
3.	II.	4	Macfarlane's 'Indian Empire.'
4.	III.	5	Bengal as it is.
5.	III.	6	Notes on the Left or Calcutta Bank of the Hooghly.
6.	IV.	8	Notes on the Right Bauk of the Hooghly.
7.	IX.	17	The Efficiency of Native Agency in Government Employ.
8.	XII.	23	Second Punjab War.
9.	XIII.	25	Annals of the Bengal Presidency for 1849.
10.	XV.	29	Annals of the Bengal Presidency for 1850.

ইহার মধ্যে 4, 5, 6, 9 ও 10 সংখ্যক প্রবন্ধগুলিকে বাংলা দেশের তদানীন্তন অবস্থা ও ভূগোল সম্পর্কে বিচিত্র তথ্যের আকর বলা যাইতে পারে।

জন ক্লার্ক মার্শম্যান ১৮৩৩ সনে প্রকাশিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'য় ইংরেজীতে একটি ভূমিকা যোজনা করেন। ১৮২৬ সনে প্রকাশিত রেভারেণ্ড এফ. সি. জি. শ্রুটার (Schroeter) লিখিত 'A Dictionary of Bhotanta or Boutan Language' বইখানি সম্পাদন করেন জন মার্শম্যান।

বাংলা

বাংলা রচনাপঞ্জী প্রস্তুতির অসুবিধা ঘটাইয়া গিয়াছেন মার্শম্যান নিজে। অনেকগুলি পুস্তকের আখ্যাপত্রে তিনি নিজের নাম যোজনা করেন নাই। 'সমাচার দর্পণে'র ব্রজেন্দ্রনাথ-কৃত সংকলন 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' দুই খণ্ড ও লঙের ক্যাটালগ দুইটি এবং মার্ডকের ক্যাটালগ তন্ন তন্ন করিয়া ঘাঁটিয়া যে সামান্য তথ্য পাইয়াছি, তাহার সহিত নেতি-নেতি-পদ্ধতির বিচার যোগ করিয়া বাংলা রচনাপঞ্জীটি খাড়া করিতে হইয়াছে। ভুলভ্রান্তি হওয়া অসম্ভব নয়। আইনের দুইটি বই, ক্ষেত্রবাগান সংক্রান্ত একটি দুই খণ্ডে, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' দুই খণ্ড, 'পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ', ইংরেজী-বাংলা ও বাংলা-ইংরেজী অভিধান দুইটি, আইনের অভিধান একটি—এই আটখানিতে মাত্র তাঁহার নাম সংযোজিত আছে। সেগুলির কালানুক্রমিক তালিকা এইরূপ :

১. A Dictionary of the Bengalee Language, abridged from Dr. William Carey's 'Dictionary' in three volumes by J, C. Marshman Vol. I, Bengalee aud English ; 1827 pp 531.

২. ঐ Vol. II English and Bengalee, 1828 pp. 440.

"The former volume of this Work was an abridgement of Dr. Carey's valuable Dictionary in three Volumes Quarto. In the present Volume, the Editor has simply to acknowledge the valuable assistance he has received from Dr. Carey in the revision of the sheets as they passed through the press ; and to take upon himself all responsibility for the inperfections of the Work. Serampore, Dec. 10, 1828."

John. C. Marshman."

দুইখানিই শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

৩. "ভারতবর্ষের ইতিহাস। অর্থাৎ কোম্পানী বাহাদুরের সংস্থাপনাবধি মার্কুইশ হেষ্টিংসের রাজশাসনের শেষ বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ইংলণ্ডীয়েরদের কৃত তাবদ্বিবরণ।

শ্রীযুত জান মার্শমন সাহেব কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় সংগৃহীত।

১ম বালম পৃ. ৩৭৪

ঐ ২য় বালম পৃ. ৩৯১

[দুই খণ্ডই] শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত। সন ১৮৩১ সাল।"

'সমাচার দর্পণে'র সংবাদে প্রকাশ, টাইটেল পেজে লেখকের নাম সহ এই গ্রন্থ ১৮৩২ সনের ১লা জানুয়ারি তারিখে বাহির হইয়াছিল।

৪. Agri-Horticultural Transactions—ক্ষেত্রবাগান বিবরণ [বিজ্ঞান ?] দুই খণ্ডে। ১ম খণ্ড ১৮৩১, ২য় খণ্ড ১৮৩৬। দুই খণ্ডে ৭৩০ পৃষ্ঠা।

এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি প্রভৃত ব্যয়ে মার্শম্যানকে দিয়া এই অনুবাদ প্রস্তুত করান। ইহাতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ও স্থানে বিভিন্ন কৃষি-দ্রব্যের উৎপাদন সম্বন্ধে তথ্য ও নির্দেশ আছে। তন্মধ্যে তুলা, সেগুন (teak), চা, কফি, ইক্ষু, চাল, এরারুট, গুটিপোকা, তামাক, আলু ও পীচের চাষ উল্লেখযোগ্য।

৫. "পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ। অর্থাৎ পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি খ্রীষ্টীয়ান শকের আরম্ভ পর্যন্ত।"

Brief Survey of History Pt. I from the Creation to the Beginning of the Christian Era Translated by John C. Marshman, English and Bengali. পৃ. ৬+৫১৩। শ্রীরামপুর ১৮৩৩।

৬. "দেওয়ানী আইনের সংগ্রহ অর্থাৎ যে সকল আইন ও আইনের অর্থ ও সরক্যুলর অর্ডর প্রভৃতি ইং ১৭৯৩ সাল লাং ১৮৪৩ সাল হইয়াছে তাহা।

শ্রীযুত জান মার্শমন সাহেব কর্তৃক সংগৃহীত। দুই বালম। [পৃ. ৪০০+৩৮৫] শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে মুদ্রিত হইল। ১৮৪৩ সাল।"

৭. দারোগারদের কর্ম্মপ্রদর্শক গ্রন্থ। পৃ. ১৮+৩৯৫। শ্রীরামপুর ১৮৫১।

৮. ব্যবস্থাবিধান [A Dictionary of Law Terms by John Clark Marshman] ১৮৫১।

জন রবিনসনের 'ডিকশনারি অব ল অ্যাণ্ড আদার টার্মস' (১৮৬০) এই বইখানিরই পূর্ণতর পরিণতি।

ইহা ছাড়া আরও চারিখানি পুস্তকের সন্ধান পাইতেছি, যাহার লেখক আর কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। ১৮২২ সনে মূল ইংলণ্ডীয় সমিতির সঙ্গে হঠাৎ বিচ্ছেদে শ্রীরামপুর গোষ্ঠীকে অত্যন্ত বিপন্ন হইতে হয়। কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড তিন জনেই তখন বৃদ্ধ। ফেলিক্স কেরী মৃত। যে তরুণ উৎসাহী দল ১৮১৭ সনের পূর্বে শ্রীরামপুরে সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা মতান্তর-প্রসূত কলহে বিচ্ছিন্ন হইয়া কলিকাতায় স্বতন্ত্র মিশন, স্বতন্ত্র গীর্জা ও স্বতন্ত্র ছাপাখানা স্থাপন করিয়া ও স্কুল বুক সোসাইটির সহিত যুক্ত হইয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন। ফেলিক্স, ইয়েটস, পীয়ার্স, লসনের অভাবে শ্রীরামপুর কানা হইয়া গিয়াছে বলা চলে। কর্মক্ষম দুই জন মাত্র অবশিষ্ট আছেন—জন ম্যাক ও জন ক্লার্ক। নূতন উৎসাহে কলেজ ও স্কুল চলিতেছে, নূতন পাঠ্য পুস্তক প্রয়োজন। ম্যাক গ্রীক, লাটিন ও কেমিষ্ট্রির অধ্যয়ন-অধ্যাপনা লইয়া আছেন, স্কুলপাঠ্য প্রাথমিক ও সাধারণ জ্ঞানের বহি রচনার ভার মার্শম্যানকেই লইতে হইয়াছে। সেইগুলি হইতেছে:

৯। "সদ্গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস।
সকল লোকের হিতার্থে বাঙ্গলা ভাষায় তর্জমা করা গেল। তাহার এক দিগে ইঙ্গরেজী ও এক দিগে বাঙ্গলা। [দুই ভাগ, মোট ৯৫টি ইতিহাস, ২৩৯ পৃ.]
শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। ১৮২৯।"

বইখানির ইংরেজী নাম 'Anecdotes of Virtue and Valour.' ১৮১৮ সনের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত মাসিক 'দিগ্দর্শনে'র জন্য মার্শম্যানকে পাশ্চাত্ত্য উৎস হইতে এই সকল "অ্যানেকডোট" সংগ্রহ করিতে হইয়াছে ও মাসে মাসে "ইতিহাস" নামে 'দিগ্দর্শনে'র পৃষ্ঠা পূরণার্থে ব্যবহার করিতে হইয়াছে। সেই সংগ্রহ দীর্ঘ এগার বৎসর পরে কাজে লাগান হইল। মার্শম্যানের ইচ্ছা ছিল, এই সংগ্রহ চারি খণ্ডে বাহির করিবেন।

'সমাচার দর্পণে'র ১৮২৯ সনের ১৫ই আগস্ট তারিখের একটি বিজ্ঞাপনে দেখিতেছি :

"সদ্গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস। গত ১ আগস্ট তারিখে সদ্গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাসের প্রথম ভাগ শ্রীরামপুরে প্রকাশ হইয়াছে সেই পুস্তকের এক পৃষ্ঠে আসল ইঙ্গরেজী এবং তাহার সম্মুখ পৃষ্ঠে বাঙ্গলা তর্জমা আছে। তাহা চারি ভাগে সমাপ্ত হইবে প্রত্যেক ভাগের মূল্য ১৲ টাকা।"

১৮৩০ সনের ২৭শে ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সমাচার দর্পণে' দ্বিতীয় ভাগের প্রকাশ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে :

"এক্ষণে প্রকাশ হইয়াছে।...সদ্গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস বাঙ্গলা ও ইংরেজী তাহার দ্বিতীয় ভাগ। মূল্য ১ টাকা।"

পূর্বে বিজ্ঞাপিত ৩য় ও ৪র্থ ভাগ আর বাহির হয় নাই।

১৮৬৮ সনে জর্জ স্মিথ বিলাত-প্রবাসী মার্শম্যানকে তাঁহার বাংলা ভাষা-সাহিত্য বিষয়ক কীর্তির কথা জানিতে চাহিলে মার্শম্যান "not without a protest against intruding his own name" "নিজেকে জাহির করার বিপক্ষে আপত্তি জ্ঞাপন করিয়া" বলেন—

[মিশনের সেই দুঃসময়ে] "Dr. Marshman took charge of the department of labour, and I was employed in translating into Bengali the books used in the School. More than half a dozen of those treatises were brought into use before the year 1818." অর্থাৎ "খাটুনির [শ্রম বিভাগের] কাজের দায়িত্ব ডক্টর মার্শম্যান গ্রহণ করেন এবং আমি বিদ্যালয়-পাঠ্য বইগুলির বাংলা অনুবাদে নিযুক্ত হই। ১৮১৮ সনের পূর্বেই আধ ডজনেরও বেশি এই সকল বই চালু হইয়া যায়।"

ইহাদেরই দুইটি মুদ্রিত হয় ১৮৩৩-৩৪ সনে। সেগুলি এই।

'সমাচার দর্পণে' (১৩ মার্চ, ১৮৩৩) প্রকাশ—

১০। "মারিচ (Murray's) গ্রামার।—সংপ্রতি শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে পাঠশালার ছাত্ত্রেরদের ইঙ্গরেজী বিদ্যা শিক্ষার্থ সংক্ষেপে মারিচ গ্রামার গৌড়ীয় ভাষায় তর্জমা হইয়া মুদ্রাঙ্কিত পূর্বক প্রকাশ হইয়াছে। মূল্য ১॥০ টাকা।"

এবং 'সমাচার দর্পণে' (১৯ জুলাই ১৮৩৪) প্রকাশ—

১১। "Just published at the Serampore Press : Part I of An Interlinear Translation of Esop's Fables in Bengalee and English. Price 4 annas."

দুইখানি পুস্তকই যে জন ক্লার্ক মার্শম্যানকৃত, রেভারেণ্ড লং তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন।

আর কাহাকেও গ্রন্থকাররূপে চিহ্নিত করা যাইতেছে না বলিয়া আর একখানি গ্রন্থও জন মার্শম্যানের ভাগে পড়িতেছে। শ্রীসুশীলকুমার দে তাঁহার 'বেঙ্গলি লিটারেচার ইন দি নাইনটিন্‌থ্‌ সেঞ্চুরি' গ্রন্থের ২৪৬-৪৭ পৃষ্ঠায় সন্দেহ-দোলায়িতচিত্তে 'সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস' ও এই বইটিকে মার্শম্যানের পুস্তক-তালিকায় স্থান দিয়াছেন। পরবর্তী সকল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার দ্বিধাহীনচিত্তে দে মহাশয়ের অনুমানকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সব শেষের এই বইখানি হইতেছে :

১২। "জ্যোতিষ এবং গোলাধ্যায়। অর্থাৎ জ্যোতিষ পদার্থের ও পৃথিবীর আকৃতি ও নানা দেশ ও নদী ও পর্ব্বত ও রাজ্যাধিকার ও ঈশ্বরারাধনা ও বাণিজ্য ও লোকসংখ্যা ইত্যাদির বিবরণ।

লোকেরদের বিশেষ জ্ঞাপনার্থে। বাঙ্গালি ভাষাতে তর্জ্জমা হইল। শ্রীরামপুরে দ্বিতীয় বার ছাপা হইল। সন ১৮১৯।" পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৮১।

ইংরেজী টাইটেল—'Treatises of Astronomy and Geography Translated into Bengalee.'

১৮২২ সনে দিল্লীর টমসন সাহেব ইহার হিন্দী অনুবাদ প্রকাশ করেন।

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ কোথাও দেখিতে পাই নাই। কোনও পুরাতন পুস্তক-সংগ্রহের (ব্রিটিশ মিউজিয়ম, ইণ্ডিয়া অফিস, ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, এসিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ) তালিকায় প্রথম সংস্করণের উল্লেখ নাই। ১৮১৮ সনের পূর্বে যে আধ ডজনের অধিক পুস্তক অনুবাদের উল্লেখ জন মার্শম্যান স্বয়ং করিয়াছেন (জর্জ স্মিথের নিকট), ইহা তাহারই একখানি হওয়া অসম্ভব নয়। এই পুস্তক বীজাকারে 'দিগ্‌দর্শনে'র পৃষ্ঠাতেও আত্মগোপন করিয়া আছে। 'দিগ্‌দর্শনে'র প্রধান লেখক এবং সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ লেখকসংখ্যা তখন দুই জন, ফেলিক্স কেরী ও জন মার্শম্যান। ফেলিক্সের রচিত পুস্তকের তালিকা জন বহু বার বহু স্থলে প্রচার করিয়াছেন। তন্মধ্যে 'জ্যোতিষ এবং গোলাধ্যায়ে'র উল্লেখ নাই। নিজের কথা স্পষ্ট করিয়া তিনি কুত্রাপি বলেন নাই। 'সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস' ও 'জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়ে'র লেখকের নাম গোপনের সম্ভবতঃ ইহাই কারণ।

সাময়িকপত্র পরিচালন ও সম্পাদন

চারিটি সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রের সহিত সম্পাদক হিসাবে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের নাম যুক্ত হইয়া আছে : ১. দিগদর্শন, ২. সমাচারদর্পণ, ৩. ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া (ইংরেজী), ৪. গবর্নমেণ্ট গেজেট। সে কালে পত্র-পত্রিকায় সম্পাদকের নাম প্রকাশের রীতি ছিল না। 'গবর্নমেণ্ট গেজেট' দেখি নাই, তাহাতে জন মার্শম্যানের নাম মুদ্রিত হইত কি না জানি না, কিন্তু অন্য তিনখানিতে তাঁহার নাম মুদ্রিত দেখি নাই। পরবর্তী কালে পত্রান্তরের সহিত বাদানুবাদে 'সমাচার দর্পণে'র সম্পাদককে বার বার আত্মপ্রকাশ করিতে হইয়াছে। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি :

১৮৩৪ সনের নবেম্বরের প্রথম সপ্তাহের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় ডক্টর উইলিয়ম কেরীকে 'সমাচার দর্পণে'র "স্রষ্টা"র গৌরব দেওয়া হইলে ১৫ই নবেম্বরে 'সমাচার দর্পণে' জন মার্শম্যান লেখেন : "...এক বিষয়ে তাহার কিঞ্চিৎ ভ্রম আছে। তিনি লিখিয়াছেন, দর্পণ পত্র প্রথমতঃ ৺ডাক্তর কেরী সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহা প্রকৃত নহে। দর্পণের এইক্ষণকার সম্পাদক যে ব্যক্তি, কেবল সেই ব্যক্তির ঝুঁকিতেই ষোল বৎসরেরও অধিক হইল অর্থাৎ দর্পণের আরম্ভাবধি এই পয্যন্ত প্রকাশ হইয়া আসিতেছে।" 'সমাচার দর্পণে'র প্রকাশ প্রসঙ্গ জন মার্শম্যান তাঁহার ইংরেজী 'কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৬১-১৬৪ পৃষ্ঠায় ও জর্জ স্মিথের নিকট প্রদত্ত স্মৃতিকথায় ('Twelve Indian Statesmen') বিস্তারিত ভাবে দিয়াছেন। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র প্রকাশ-প্রসঙ্গ মার্শম্যানের গ্রন্থের ১৬৪-৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

'দিগ্দর্শন' ১৮১৮ সনের এপ্রিল মাসে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ইহা নিঃসংশয়ে বাংলা ভাষার প্রথম সাময়িক মাসিক-পত্র। এই পত্রিকা পরিচালনায় ফেলিক্স কেরী ও জন মার্শম্যানের সমান কৃতিত্ব। বস্তুতঃ আরাকানের জঙ্গল হইতে পাকড়াও করিয়া আনা উদাসীন ফেলিক্সকে কাজের চাপে ফেলিয়া প্রকৃতিস্থ করার উদ্দেশ্যেই সহৃদয় উইলিয়ম ওয়ার্ড 'দিগ্দর্শনে'র পরিকল্পনা করেন। বিজ্ঞান ও ইতিহাসেই ফেলিক্সের স্ফূর্তি ছিল, তিন বৎসর স্থায়ী ২৬ সংখ্যার 'দিগ্দর্শনে' (১৮১৮ এপ্রিল—১৮২১ ফেব্রুয়ারি) ফেলিক্স প্রচুর লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে জন স্টুয়ার্ট মিলের পিতা জেম্স্ মিলের সুবিখ্যাত ভারতবর্ষের ইতিহাসের ('History of British India'-1817) প্রথমাংশের (১০০০ খ্রী. হইতে ১৭৫৬ খ্রী. পর্যন্ত) অনুবাদ ধারাবাহিক ভাবে দশম ভাগ (জানুয়ারি ১৮১৯) হইতে ২৬ ভাগ 'দিগ্দর্শনে' বাহির হয়। এই ইতিহাস পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। ইহারই শেষাংশ "ভারতবর্ষে ইংলণ্ডীয়েরদের রাজবিবরণ" অধ্যায় হইতে ১৮১৮ সন পর্যন্ত অনুবাদ করিয়া জন মার্শম্যান ১৮৩১ সনে 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' দুই খণ্ড প্রকাশ করেন। 'দিগ্দর্শনে' জন ক্লার্ক মার্শম্যানের লেখাও প্রচুর। 'দিগ্দর্শনে'র সম্পাদক হিসাবে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের নাম যদি প্রচারিতই হইয়া থাকে, কিছুই অন্যায় হয় নাই। তবে এ কথা আমাদের স্মরণ

রাখিতে হইবে যে, ১৮২১ সনে ফেলিক্সের কঠিন পীড়া ও ১৮২২ সনে তাঁহার মৃত্যু ঘটায় 'দিগ্‌দর্শন' প্রকাশ রহিত হইয়া যায়।

'সমাচার দর্পণ' সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র "ভূমিকা"য় ও 'বাংলা সাময়িক পত্রে' বিস্তারিত লেখা হইয়াছে। গোড়ার দিকে জোশুয়া মার্শম্যান ও ওয়ার্ড যে ভাবেই ইহার সহিত যুক্ত থাকুন এবং গোড়ায় বিরোধী, পরে সমর্থক কেরী যতই আনুকূল্য করুন, আসলে এই পত্রিকা চালাইতেন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিতদের সহায়তায় যুবক জন ক্লার্ক মার্শম্যান। তিনি নিজেও ইহাতে বড় কম লিখিতেন না। ১৮১৮ সনের ২৩ মে প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর ১৮৪১ সনের ২৫ ডিসেম্বর মিশন গোষ্ঠীর পরিচালনায় ইহার শেষ সংখ্যা প্রকাশ পর্যন্ত জন ক্লার্ক মার্শম্যানই যে এই পত্রিকা পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। এই সাড়ে তেইশ বৎসর কালে 'সমাচার দর্পণ' সাপ্তাহিক, সপ্তাহে দুই বার এবং ইংরেজী-বাংলা দ্বিভাষিক —বহু মূর্তিতেই প্রকাশ পাইয়াছে। বাংলা ভাষাকে সহজ, সরল, সর্বজনবোধ্য করিয়া ইহা যে বাংলা সাহিত্যের উন্নতির পথ সুগম করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইংরেজী 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' মাসিকরূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৮১৮ সনের মে মাসে। প্রথম সংখ্যার গোড়ায় ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী একটি 'প্রস্পেক্টাস' যোজিত হয়। তাহা পাঠে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রবীণ কেরী, মার্শম্যান. ওয়ার্ডই ইহার সম্পাদন-দায়িত্ব লইয়াছিলেন। পরে অবশ্য একা জন মার্শম্যানের কাঁধে এই দায়িত্ব আসিয়া পড়ে। ১৮৫২ সনে তাঁহার বিলাতযাত্রা পর্যন্ত এই পত্রেরও নানা রূপান্তর হয়। এখনও 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রের শিরোনামায় 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' নামে মাত্র বাঁচিয়া আছে।

'গবর্নমেণ্ট গেজেট' প্রসঙ্গ ব্রজেন্দ্রনাথের 'বাংলা সাময়িক পত্র' নূতন সংস্করণের (১৩৫৪, মাঘ) ৭৬-৭৭ পৃষ্ঠায় সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে।

জন ক্লার্ক মার্শম্যান ও বাংলা ভাষা

বাংলা ভাষা প্রসারের বৈদেশিক সহায়ক-মণ্ডলীর মধ্যে উইলিয়ম কেরী ও ফেলিক্স কেরীর পরেই জন ক্লার্ক মার্শম্যানের তৃতীয় স্থান, শুধু বয়সে নয়, কৃতিত্বেও। তাঁহার 'ক্ষেত্রবাগান বিবরণ,' 'দেওয়ানি আইনের সংগ্রহ' বা 'দারোগার কর্ম্মপ্রদর্শক গ্রন্থ' বাংলা ভাষাকে কতখানি সরল বা জটিল করিয়াছে, সে বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়াও তাঁহার বাংলা-ইতিহাস গ্রন্থগুলি হইতেই প্রমাণ করা যায়, ১৮৩৪ সনের পূর্বে যাঁহারা বাংলা গদ্যের গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন, জন মার্শম্যান তাঁহাদের একজন, শিল্পী হয়ত নন, কিন্তু একনিষ্ঠ কর্মী। এই কর্মীই শিল্পী হইয়া উঠিয়াছেন 'সমাচার দর্পণে'র পৃষ্ঠায়। আমি সেই ক্রমবিকাশ দেখাইতেই চেষ্টা করিতেছি।

যে লেখাকে নিঃসংশয়রূপে জন মার্শম্যানের সর্বপ্রথম মুদ্রিত রচনা বলিয়া চিহ্নিত করিতে

পারি, তাহা হইতেছে ১৮৩৩ সনে পুস্তকাকারে প্রকাশিত 'পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণে'র প্রথম খসড়া, ১৮১৮ সনের জুন মাসের (তৃতীয় সংখ্যা) 'দিগ্দর্শনে' "খ্রীষ্টের পূর্ব্বে পৃথিবীর ইতিহাসের সংক্ষেপ বিবরণ" নামে প্রকাশিত হয়। তাহার আরম্ভটা এই :

"পৃথিবী প্রায় ছয় হাজার বৎসর নিম্মিতা হইয়াছে। পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি অদ্য পর্য্যন্ত যে কাল গত হইয়াছে সে কাল তিন ভাগে বিভক্ত হয়। প্রথম ভাগ সৃষ্টি অবধি জলপ্রাবন পর্য্যন্ত ষোল শত ছাপ্পান্ন বৎসর। দ্বিতীয় জলপ্রাবনাবধি খ্রীষ্টের জন্ম পর্য্যন্ত তেইশ শত আটচল্লিশ বৎসর। তৃতীয় খ্রীষ্টের সময়াবধি অদ্য পর্য্যন্ত আটার শত আটার বৎসর। এই মত ভাগে ভাগে কাল নিদ্দিষ্ট করণের উপকার এই যে পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি যে কর্ম্ম হইয়াছে সে সকল ক্রিয়া সময়ানুসারে নিদ্দিষ্ট হইয়া মনে থাকে।

"ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে পৃথিবীর সৃষ্টি হইল। ঈশ্বর ছয় দিনে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া সপ্তম দিবসে আপন কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম করিলেন যেহেতুক তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইল। এই হেতুক ঈশ্বর আজ্ঞা করিয়াছেন যে, সকল মনুষ্যেরা সপ্তাহের এক দিবস সাংসারিক কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম করিবে এবং সেই এক দিবসে ঈশ্বরের প্রতি আপন মনোনিবেশ করিবেক। তিনি দুইজনকে প্রথমে সৃষ্টি করিলেন এক পুরুষ ও এক স্ত্রী। সে দুইজন নিষ্পাপী। যে পর্য্যন্ত পাপ সেই স্ত্রীর মনে প্রবেশ না করিল সে পর্য্যন্ত ঐ দুই ব্যক্তি এদেন উদ্যানে পরম সুখে কালক্ষেপ করিল। পরে সে স্ত্রী ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আপন স্বামিকে সেইরূপ করিতে প্রবৃত্তি দিল। সেই অবধি লোকেরা নিত্য পাপ করিতেছে এবং সতত সুখ চেষ্টা করিতেছে কিন্তু সুখ কখন পায় না। পৃথিবীর প্রথম কালে লোকেরা যে পরম সুখে বাস করিত এই কিম্বদন্তী সকল জাতিমধ্যেই লোকপরম্পরাসিদ্ধা আছে। গ্রীকেরা সে সময়কে স্বর্ণময় করিয়া কহিত। হিন্দু লোকেরা সে সময়কে সত্যযুগ করিয়া কহে। পাপের সঙ্গে অযাথার্থ্য ও বধ ও মিথ্যা ও অন্য সকল কুক্রিয়া জগতে প্রবেশ করিল। আদমের দুই পুত্র ছিল কঈন ও হাবেল। হাবেল আপন ভ্রাতা হইতে যাথার্থিক ছিল সে নিমিত্তে তাহার ভ্রাতা তাহাকে সংহার করিল।"

জনের সম্মুখে বাংলা ভাষায় ইতিহাস রচনার একটি মাত্র আদর্শ ছিল—১৮০৮ সনে মুদ্রিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'রাজাবলি'। বাংলা ভাষায় মুদ্রিত "ইতিহাস" বলিতে ইহাই সর্বপ্রথম। মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতি জন মার্শম্যানের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল, তিনি তাঁহাকে সাহিত্যের "দিগ্‌গজ" ("Colossus") মনে করিতেন এবং তাঁহার 'দি লাইফ অ্যাণ্ড টাইম্‌স অব কেরী, মার্শম্যান অ্যাণ্ড ওয়ার্ড' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৮০ পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন, "his Bengalee composition has never been surpassed for ease, simplicity, and vigour." স্বয়ং উইলিয়ম কেরী মৃত্যুঞ্জয়ের নিকট প্রত্যহ দুই তিন ঘণ্টা করিয়া বাংলা রচনার পাঠ লইতেন। তরুণ মার্শম্যানও মৃত্যুঞ্জয়েরই বিনীত ও ভক্ত ছাত্র ছিলেন।

'রাজাবলি'র আরম্ভটুকু উদ্ধৃত করিলেই শিষ্যের প্রাথমিক চেষ্টার সাফল্যের কারণ বুঝা যাইবে :

"ব্রহ্ম প্রভৃতি কীট পর্য্যন্ত জীবলোকের ও ঐ জীবলোকেরদের ভূর্লোকাদি সত্যলোক পর্য্যন্ত উর্দ্ধতন সপ্তলোক অতলাদি পাতাল পর্য্যন্ত অধস্তন সপ্তলোকরূপ নিবাস স্থানের ও অমৃত যব ব্রীহি তৃণাদিরূপ তাবদ্ ভোগ্য বস্তু সকলের ও স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে স্বর্গ নরক বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থার ও কল্প মন্বন্তর যুগাদিরূপ কাল বিভাগের কর্ত্তা পরমেশ্বর সকলের মঙ্গল করুন।

"পিতৃকল্পাদি ত্রিংশৎ কল্পের মধ্যে ঘটীযন্ত্রের ন্যায় কালচক্রের ভ্রমণবশতঃ বর্ত্তমান শ্বেত-বারাহ কল্প যাইতেছে। একৈক কল্পেতে চতুর্দশ চতুর্দশ মনু হয় তাহাতে শ্বেতবারাহ কল্পের মধ্যে বৈবস্বত নামে সপ্তম মনু যাইতেছেন। একৈক মনুতে দুই শত চৌরাশি যুগ হয়। তাহার মধ্যে বৈবস্বত নামে সপ্তম মনুতে একশত বার যুগের যুগ এই কলিযুগ যাইতেছে। ইহার পরিমাণ চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার বৎসর। ইহার মধ্যে সতের শত ছাব্বিশ শকাব্দা পর্য্যন্ত [১৮০৪ খ্রীঃ] গত চারি হাজার নয় শত পাঁচ বৎসর।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 'জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়ে'রও গোড়াপত্তন এই 'দিগদর্শনে'র চতুর্থ ভাগে অর্থাৎ ১৮১৮ সনের জুলাই সংখ্যায়। উহাতে প্রকাশিত "পৃথিবীর আকর্ষণের বিবরণ" প্রবন্ধটিকে বাংলা ভাষার প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বলা চলে। ইহার শেষ অংশ এইরূপ :

"এই পৃথিবী অতিশয় বড় এক বস্তু তাহার নিকটে এমত বড় আর কোন বস্তু নাই অতএব পৃথিবী চতুর্দ্দিকস্থ ছোট ছোট বস্তুকে আপন অভিমুখে আকর্ষণ করে। যখন পৃথিবী হইতে কোন বস্তু উঠান যায় তাহাকে আকর্ষণের বিপরীতে উঠাইতে হয় এই কারণ উঠাইতে ভারি বোধ হয়। সে বস্তু যদি অতি বৃহৎ হয় তবে পৃথিবীর আকর্ষণে অধিকত্ব প্রযুক্ত অধিক ভার বোধ হয়।"

ইহাই 'জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়' পুস্তকের (২য় সং, ১৮১৯) প্রথম ভাগ "জ্যোতিষ বিবরণে"র "আকর্ষণ বিষয়" নামক প্রথম নিবন্ধে এই রূপ লইয়াছে :

"সকল বস্তুতে যে ভারি বোধ হয় সেও আকর্ষণের শক্তিদ্বারা যেহেতুক পৃথিবী সকল বস্তুকে আপনার দিকে আকর্ষণ করে সে আকর্ষণের বিপরীতে কোন বস্তু উঠাইতে হইলে সুতরাং ভারি বোধ হয়।"

মনে রাখিতে হইবে, এই সকল রচনার ঠিক দুই বৎসর পরে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-রচনার অন্যতম প্রবর্তক অক্ষয়কুমার দত্ত এবং দুই বৎসর দুই মাস পরে 'বোধোদয়'-রচয়িতা ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হয়। রামমোহন তখন সবে মাত্র 'বেদান্তগ্রন্থ', 'বেদান্তসারে'র অনুবাদ প্রকাশান্তে উপনিষৎ-অনুবাদে হাত দিয়াছেন। ইহা স্মরণে রাখিলে এই বাংলা ভাষার প্রসারে এই সকল বৈদেশিক সাধকের কৃতিত্ব যে কতখানি, তাহা আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিব।

ইহার পরেই জন ক্লার্ক মার্শম্যানের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' দুই খণ্ডের উল্লেখ করিতে হয়। গ্রন্থের নামপত্রে যদিও গ্রন্থখানির প্রকাশকাল ১৮৩১ সাল মুদ্রিত আছে, আসলে কিন্তু ইহা পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ১৮২৬ সনে ছাপাখানা হইতে বাহির হইয়াছিল। আত্মগোপন-

প্রয়াসী মার্শম্যান ইহাতে নিজের নাম প্রকাশ করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে বাংলাভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীর এইটিতেই আমরা তাঁহার নাম সর্বপ্রথম মুদ্রিত দেখিতে পাই। এই কারণে, কেন বাধ্য হইয়া তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত (মুদ্রণের পাঁচ বৎসর পরে) স্বনাম জাহির করিতে হইয়াছিল, সে ইতিহাস জানা দরকার। সেই ইতিহাস অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক।

জন ক্লার্ক মার্শম্যান স্বয়ং কারণটি কৌতুক-ইঙ্গিতে বলিয়াছেন ১৮৩০ সনের ৬ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সমাচার দর্পণে' "বাঙ্গলা গ্রন্থ ও গ্রন্থকারক" নামক সম্পাদকীয় নিবন্ধে। বাংলা রচনা মাত্র বার বৎসরের অনুশীলনে তিনি মনোগত অভিপ্রায় যথাযথ প্রকাশোপযোগী ভাষায় শুধু নহে, বাংলা সাহিত্যের বিষয়বস্তুতেও কিরূপ দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন, এই নিবন্ধটিই তাহার প্রমাণ।

"বাঙ্গলা গ্রন্থ ও গ্রন্থকারক।—লিটিরেরি গেজেট নামক সম্বাদপত্রের সংপ্রতি প্রকাশিত সংখ্যক পত্রে শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ বাঙ্গলা গ্রন্থ ও গ্রন্থকারকের বিষয়ে এক প্রকরণ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন—পাঠকবর্গের উপকারার্থে তাহার স্থূল বিবরণ আমরা তর্জমা করিয়াছি এবং শ্রীরামপুরের বিষয়ে তাহাতে যাহা প্রস্তাব করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমরা দুই এক বিবেচ্য কথা প্রকাশ করিতেছি।

"·· তিনি লেখেন যে শ্রীরামপুরের মিসিনরি সাহেবেরা ইহার পূর্ব্বে গদ্যরূপে ধর্ম্মপুস্তক তরজমা করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ তরজমা ইংলণ্ডীয় ভাষার রীত্যনুযায়ি হওয়াতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের বোধগম্য হইত না। অপর মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রাজাবলি নামক গ্রন্থ অর্থাৎ ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছিলেন, ঐ গ্রন্থ পাঠকবর্গেরা উত্তমরূপে অবগত থাকিবেন অতএব তদ্বিষয়ক আমারদের কিছু লেখার প্রয়োজন নাই। বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ ঐ গ্রন্থের শব্দবিন্যাসের নিন্দা করিয়া কহেন যে তাহা নিরাবিল বাঙ্গলা নহে এবং গ্রন্থের বিবরণের বিষয়ে কহেন যে তাহাতে অনেক অমূলক বিষয় লিখিয়াছেন কিন্তু ইহাও কহেন যে এ সকল দোষ সত্ত্বেও ঐ গ্রন্থ অতিশয় উপকারক ও আবশ্যক।···

"···অনন্তর ফিলিক্স কেরি সাহেব ইংলণ্ড দেশের বিবরণ তরজমা করিয়া প্রকাশ করেন তাহাতে কাশীপ্রসাদ ঘোষ বিস্তর দোষোল্লেখ করিয়াছেন। ঐ পুস্তক যে দোষরহিত নহে ইহা আমরা স্বচ্ছন্দে স্বীকার করি। তাহাতে ইংলণ্ডীয় নাম ও ইংলণ্ডীয় উপাধির তরজমা করা এক প্রধান দোষ বটে এবং সমাসযুক্ত দারুণ সংস্কৃত বাক্য রচনা করাতে সেই গ্রন্থ সুতরাং অনেকের অগ্রাহ্য হইল কিন্তু ফিলিক্স কেরি সাহেব যেরূপ বাঙ্গলা ভাষার মর্ম্ম জানিতেন এবং ব্যবহারিক বাঙ্গলা কথা ও এতদ্দেশীয় লোকেরদের আচার ব্যবহার যেরূপ অবগত ছিলেন তদ্রূপ তৎকালে অন্য কোনও ইউরোপীয় লোক জানিতেন না এবং নিরাবিল বাঙ্গলা ভাষা রচনায় ক্ষমতাপন্ন ঐ সাহেবের তুল্য তৎকালে অন্য কোন সাহেব ছিলেন না। অবিকল সংস্কৃতানুযায়ী ভাষায় ইংলণ্ডদেশীয় উপাখ্যান গ্রন্থ রচনা করাতে তাঁহার ঐ গ্রন্থ নিষ্ফল হইল। সেই পুস্তক যদি সংশোধিত হয় এবং যদি দারুণ সংস্কৃত কথা চলিত ভাষায় রচিত হয় তবে ঐ গ্রন্থ সর্ব্বপ্রকারে সকলের উপকার্য্য হইতে পারে।

"অপর বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ কহেন যে শ্রীরামপুরে বাঙ্গলা ভাষায় যত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে তাহা সকলি দোষযুক্ত এবং এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহা শ্রীরামপুরের বাঙ্গলা বলিয়া দোষোল্লেখ করেন। ইহার যে প্রকৃত উত্তর তাহা কাশীপ্রসাদ ঘোষ আপনিই তাহার নিম্নভাগে লিখিয়াছেন যেহেতুক মিল সাহেবের ভারতবর্ষীয় ইতিহাস বাঙ্গলা ভাষায় যে তর্জমা হইয়াছে তাহার তিনি অতিশয় প্রশংসা করিয়া কহেন যে তাহার অনেক গুণ আছে এবং এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন এবং বাঙ্গলা ভাষায় রীতি ও কথার বিন্যাসাদিতে অবিকল মিল আছে এবং বাঙ্গলা ভাষায় রচিত পুস্তকের মধ্যে তাহা অগ্রগণ্য। ঐ পুস্তক শ্রীরামপুরে তরজমা হইয়া ঐ শ্রীরামপুরে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ সমাপ্ত না হওয়া প্রযুক্ত তাহার টাইটল পেজ অর্থাৎ ভূমিকাব্যতিরেকে প্রকাশ হইয়াছে। অনুমান হয় যে এই প্রযুক্ত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষের ভ্রম হইয়াছে।"

উপরের উদ্ধৃতি হইতে তিনটি তথ্য প্রকাশ পাইতেছে—১. 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' জেমস মিলের ইতিহাসের অনুবাদ, ২. ইহা ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে আখ্যাপত্রহীন হইয়া বাহির হইয়াছিল এবং ৩. ইহা শ্রীরামপুব মিশন প্রেসে মুদ্রিত 'মিসিনরি' সাহেবেরই রচিত। বস্তুতঃ বইটির প্রথম "বালম" নামপত্রহীন ভাবে যে ১৮২৬ সনের গোড়াতেই বাহিব হইয়াছিল, তাহার অকাট্য প্রমাণ মিলিতেছে ১৪ জানুয়ারি (১৮২৬) তারিখেব 'সমাচার দর্পণে'। "শ্রীরামপুর মিশন ছাপাখানায় বাহির হইয়াছে" পুস্তক-তালিকায় এই 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে'র নাম রহিয়াছে।

কাশীপ্রসাদ ঘোষের বিচারে এই বইয়ের ভাষা ১৮৩০ সন পর্যন্ত "বাঙ্গলা ভাষায় রচিত পুস্তকের মধ্যে অগ্রগণ্য।" ইহা জন ক্লার্ক মার্শম্যানের রচিত, তাহা জানিলে কাশীপ্রসাদ হয়ত সতর্ক হইতে পারিতেন। মিশনরি বাংলার উপর তাঁহার জাতক্রোধ ছিল। ভবিষ্যতে কোনও সমালোচক এইরূপ ভ্রমে না পড়েন, ইহা ভাবিয়াই জন তাঁহার রচিত-অনূদিত যাবতীয় পুস্তকে অতঃপর নিজের নাম প্রকাশ করিতে থাকেন। ১৮৩১ সনেই 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' দুই বালমে (Volume) তাঁহার নাম সংযুক্ত হয়। ১৮৩২ সনের ১লা জানুয়ারি তারিখে সম্পূর্ণ গ্রন্থ জন ক্লার্ক মার্শম্যানের নামাঙ্কিত হইয়া বাজারে বাহির হয়।

এই বইয়ের ভাষার কিছু নমুনা দিতেছি:

"ঐ দুর্ভাগ্য নবাব [সিরাজ-উদ্দৌলা] যুদ্ধের পর [২৩ জুন ১৭৫৭] রাত্রিতে আপন রাজগৃহে উপস্থিত হইয়া অবগত হইলেন যে তথাতে আর কোন মিত্র নাই অতএব ভবিতব্য বিষয়ে ভাবিত হইয়া সমস্ত দিবস রাজগৃহে থাকিলেন। সেই রাত্রিতে মীরজাফর মুরশেদাবাদে উপস্থিত হইলে সিরাজদ্দৌলার উপায়ান্তর চেষ্টা করণের আবশ্যকতা হইল অতএব তিনি কদর্য্য পরিচ্ছদে পরিহিত হইয়া এক প্রিয়তমা সৈলিনীকে [স্বৈরিণীকে] ও এক খোজাকে সঙ্গে লইয়া রাত্রি দশ দণ্ডের সময় রাজগৃহের এক ক্ষুদ্র বাতায়ন দিয়া নীচে নামিলেন এবং সুবা বেহারে গিয়া লা সাহেবের সহিত মিলনাশাতে ও সেখানকার অধ্যক্ষের সহায়তা প্রাপণাশাতে নৌকাযোগে বেহারের অভিমুখে গমন করিলেন। নাবিকেরা সমস্ত রাত্রি

দাঁড়ক্ষেপ করত অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হওয়াতে প্রাতঃকালে রাজমহলের নীচে নৌকা লাগাইল অতএব সিরাজদ্দৌলা অগত্যা উত্তীর্ণ হইয়া এক বাগানে আশ্রয় লইলেন। তিনি পূর্ব্বে এক ব্যক্তি সামান্য লোকের অপমান করিয়াছিলেন তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে সে স্থানে ঐ ব্যক্তি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলেন তাহাতে সে ব্যক্তি পূর্ব্ব রাগ স্মরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ রাজমহলের অধ্যক্ষকে সমাচার দিল এবং ঐ অধ্যক্ষ অবিলম্বে তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া মুরশেদাবাদে মীরজাফরের নিকট প্রেরণ করিল এবং মীরজাফর তাহাকে আপন পুত্রের জিম্মাতে রাখিলেন। ঐ অতিশয় নির্দ্দয় ও কঠিনস্বভাবক পুত্র রাত্রিযোগে তাঁহাকে সংহার করিল।" ১ম বালম, পৃ. ১৩১-৩২

মাত্র দুই-চারিটি শব্দ অদলবদল ও কয়েকটি যতিচিহ্ন যোগ করিয়া এই রচনাটিকে স্বচ্ছন্দে আধুনিক বলিয়া চালাইয়া দেওয়া যায়। জন বাংলা ভাষা কিরূপ আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এই ইতিহাসটিই তাহার প্রমাণ। জেমস মিলের ইতিহাস ১৮১৭ সনে বাহির হয়। জন কিন্তু তাঁহার ইতিহাসের জের ১৮২৩ পর্যন্ত টানিয়াছেন। তাই মনে হয়, ওই সনেই তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা শেষ করেন। জেমস মিলের অনুসরণ করিতে গিয়াই তাঁহার মনে ইংরেজীতে বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের মৌলিক ইতিহাস রচনার বাসনা জন্মে এবং তাহাই বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে ১৮৪০ সনে (?) তাঁহার বিখ্যাত বাংলার ইতিহাস ও ১৮৪২ সনে ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের প্রকাশে।

'সদ্গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাসে'র (১৮২৯) অনেক রচনা তৎকালপ্রচলিত বহু পাঠ্য-পুস্তক-সঙ্কলনে সন্নিবিষ্ট হইয়া বহুল প্রচারিত হইয়াছিল, যেমন দ্বিতীয় ভাগের ১৯৯-২০১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ৮৬ সংখ্যক ইতিহাস "সর জন পর্সল"। একটি ছোট্ট ইতিহাস (৬৮ সংখ্যক) ভাষার নমুনাস্বরূপ দাখিল করিতেছি :

"ক্ষুদ্র বালকের উত্তর।

অতিশয় চতুর এক ক্ষুদ্র বালক এক জন পুরোহিতের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাহাকে কহিলেন যে ঈশ্বর কোথায় ইহা কহিতে পারিলে আমি তোমাকে একটা কমলা নেবু পারিতোষিক দিব। শিশু উত্তর করিল যে ঈশ্বর যে স্থানে নাই মহাশয় এমত স্থান আমাকে দর্শাইয়া দিলে আমি মহাশয়কে দুইটা কমলা নেবু দিব।"

১৮১৮ সনে লিখিত 'ঈশপ'স ফেব্‌লস' (মুদ্রণ ১৮৩৪) হইতে ১৫ সংখ্যক গল্পটি এই :—

"মানুষ ও তাহার রাজহংস।

এক ব্যক্তির এক রাজহংস ছিল, সেই রাজহংস প্রতিদিন এক স্বর্ণডিম্ব প্রসব করিত কিন্তু ঐ ব্যক্তি লোভী হইয়া ঐ রাজহংসের উদরে যে ধন আছে ভাবিয়াছিল, তাহা এককালে পাইবার নিমিত্ত হংসকে হত্যা করিতে নিশ্চয় করিল। পরে তাহা করিয়া কিছু পাইল না। এবং তাহাতে যে স্বর্ণডিম্ব প্রতিদিন পাইত, তাহাও হারাইল।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'কথামালা'র আটত্রিশ বৎসর পূর্বে (১৮৫৬—১৮১৮) এই রচনা কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে।

মৃত্যুঞ্জয়ের প্রিয় শিষ্য জন যে বাংলা ভাষার বিবিধ রচনারীতি আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহার বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কৃতিত্বের অনুপাতে বাংলা সাহিত্যে জনের খ্যাতি না হওয়ার প্রধান কারণ, তাঁহার পরবর্তী পলিটিক্যাল জীবন এবং তাঁহার সমসাময়িক বাঙালী লেখক ও সম্পাদকমণ্ডলীর অভ্যুত্থান ও স্বদেশ ও স্বসাহিত্য সম্পর্কে সচেতনতা।

জন ক্লার্ক মার্শম্যানের বাংলা রচনার বিশেষ মুনশিয়ানা 'সমাচার দর্পণ' (১৮ জুন, ১৮২৫) হইতে নীচের উদ্ধৃতিটি পড়িলেই উপলব্ধি হইবে। গদ্য রচনার চরম উৎকর্ষ হিউমারের প্রয়োগে। এই ব্যঙ্গব্যঞ্জনার্থক রচনাতেও তিনি যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত—

"ডেকসিয়ানরি প্রস্তুত করা অপেক্ষায় সহিষ্ণুতার কর্ম্ম আর নাই। পৃথিবীর মধ্যে নানা লোকেরা নানা বিষয়ে পরম সুখ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ এক মুদ্রার উপর অন্য মুদ্রা রাখিয়া রাশীকরণে পরমসুখ জ্ঞান করেন কেহ বা বৃক্ষমূলে বসিয়া নূতন নূতন কাব্য পাঠ করিতে পরম সুখ জ্ঞান করেন কেহ বা আপন জ্যেষ্ঠ সন্তানের প্রথম বাক্যেতে পরম সুখ জ্ঞান করেন কেহ বা সমুদ্রতীরে বসিয়া তরঙ্গ দেখিতে পরমাপ্যায়িত হন আরো কেহ বালক্রীড়ার স্থান পুনর্দর্শনে পরম তুষ্ট হন কিন্তু উহার কোন সুখ ডেকসিয়ানরি করার তুল্য সুখ নয়।

"কিন্তু রহস্য ছাড়িয়া যথার্থ কহিতে হইলে ডেকসিয়ানরি প্রস্তুত করার তুল্য পরিশ্রম পৃথিবীর মধ্যে আর কোন কর্ম্মে নাই। ডেকসিয়ানরিকর্ত্তারা বিদ্যার মজুর, তাঁহারা মালমশালা প্রস্তুত করিয়া দেন অন্যেরা ঘর গাঁথে। যদি আমারদের কোন শত্রু থাকিত এবং তাহাকে কোন দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য হইত তবে আমরা তাহাকে পোনর বৎসর পর্য্যন্ত কেবল ডেকসিয়ানরি প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত করিতাম। কিন্তু অন্য পক্ষে দৃষ্টি করিলে এইরূপ ডেকসিয়ানরি করাতে যত পরিশ্রম ততোধিক সংভ্রম। উত্তম কোষকর্ত্তারা সত্য অমর হন, যত কাল পর্য্যন্ত ভাষা থাকে তত কাল পর্য্যন্ত তাঁহারা স্মরণীয় থাকেন।"

এই মন্তব্য যদিও রামকমল সেনের অভিধান প্রসঙ্গে, আসলে কিন্তু ইহা তাঁহার নিজের সুখ ও দুঃখের কথা। তিনি তখন উইলিয়ম কেরীর বৃহৎ অভিধান হইতে বাংলা-ইংরেজী এবং স্বয়ং ইংরেজী-বাংলা অভিধান সংকলন করিতেছিলেন।

বাংলা ভাষায় ভারত-শাসক কোম্পানীর আইনগুলি বাংলাদেশের সর্বত্র প্রচারিত ও গ্রাহ্য হইয়াছিল প্রধানতঃ জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সহজ সরল অনুবাদের সাহায্যে। এগ্রিকালচার-হর্টিকালচারও বাংলায় রূপান্তরিত হইয়া জনপ্রিয় হইয়াছিল। এগুলি সাহিত্যের আওতায় আসে না বলিয়া মার্শম্যানের আইন ও বিজ্ঞান বিষয়ের কীর্তি সম্বন্ধে আমরা সচেতন নই। তবে এ কথা আজ স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, ১৮৪০ সনের পূর্বে অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত ও

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের পূর্বে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, তারাচাঁদ দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ও উদয়চাঁদ আঢ্য প্রভৃতির সঙ্গে জন ক্লার্ক মার্শম্যানও বাংলাভাষাকে সর্ববিধ কাজের এবং শেষ পর্যন্ত সাহিত্যের উপযোগী করিয়া তুলিতে কম সাহায্য করেন নাই।

১৮৩৪ সনের ৪ঠা জুন তারিখের 'সমাচার দর্পণ' হইতে আর একটি মাত্র দৃষ্টান্ত বাংলা ভাষার উপর জনের অসাধারণ দখলের প্রমাণস্বরূপ দাখিল করিতেছি। চিন্তাশীলতা ও যুক্তির সহিত ভাষার সামঞ্জস্য বিধানেই সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। বাংলা ভাষায় মৌলিক চিন্তার সূত্রপাত করেন মৃত্যুঞ্জয় ১৮০২ সনে তাঁহার 'বত্রিশ সিংহাসনে', প্রসার ঘটান রামমোহন ১৮১৫ সনে তাঁহার 'বেদান্ত গ্রন্থে' এবং পূর্ণ পরিণতি ঘটে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ১৮৪৩ সনে। মাঝখানে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের চিন্তাপ্রসূত রচনা এই পরিণতিতে প্রভূত সাহায্য করে। দৃষ্টান্তটি এই :

"*বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত গ্রন্থ ছাপাওনের অতিস্পষ্ট কারণ এই যে চিরকালাবধি বঙ্গদেশীয় তাবৎ* পণ্ডিত সংস্কৃত গ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে লিখিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহারা আর কোন অক্ষর ব্যবহার করেন না ও করিবেনও না। কএক বৎসর হইল যখন ফোর্টউলিয়ম কালেজ স্থাপিত হয় এবং মাসে ৩০ অবধি ২০০ টাকা পর্য্যন্ত বেতনে পণ্ডিত নিযুক্ত হন তখন তাবৎ পণ্ডিতদিগকে জ্ঞাত করা যায় যে দেবনাগর অক্ষর না জানিলে এ কর্ম্ম দেওয়া যাইবে না। অতএব লোভপ্রযুক্ত অনেকেই দেবনাগর অক্ষর শিক্ষা করিলেন কিন্তু তাঁহারা এ অক্ষরে স্ব স্ব লিপ্যাদি ব্যবহার করিলেন না। এইক্ষণে কালেজের প্রায় কিছুই নাই এবং তাহাতে কোন পণ্ডিতও নাই অতএব এতদ্দেশীয় পণ্ডিতেরদের মধ্যে দেবনাগর অক্ষর ব্যবহার একেবারে রহিত হইয়াছে। অতএব দেখুন তৎসময়ে দেশের চলিত অক্ষরের পরিবর্ত্তে দেবনাগর চলিত করণার্থ এক মহোদ্যোগ হয় কিন্তু তাহা তাবৎ বিফল হইল। অতএব আমারদের বোধ হয় বঙ্গাক্ষর এমত মূলবদ্ধ হইয়াছে যে তাহার পরিবর্ত্তে দেবনাগর অক্ষর চলিত করা অসাধ্য এবং যদ্যপি ভারতবর্ষে ও ইউরোপে সংস্কৃত বিদ্বান্ সাহেবলোকেরা আশ্চর্য্য বোধ করেন তথাপি নিশ্চয় জানা গিয়াছে যে বঙ্গদেশে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচলিত হওনার্থ বঙ্গাক্ষরে অবশ্য মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইবে। ভারতবর্ষের মধ্যে ইংলণ্ডীয়েরদের যত প্রজা আছে তাহারদের আট অংশের তিন অংশ বঙ্গাক্ষর ব্যবহার করে এবং বঙ্গাক্ষরে যত গ্রন্থ প্রস্তুত আছে তত আর কোন অক্ষরেই নাই।"—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৯

আজ এক শত পঁচিশ বৎসর পরেও বাঙালী পণ্ডিতদের দেবনাগর-অক্ষর-বিমুখতা প্রসঙ্গে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের মন্তব্য সমান প্রযোজ্য।

উপসংহার

ডক্টর জর্জ স্মিথ ১৮৯৭ সনে চার্লস গ্রান্ট, হেনরি লরেন্স, জন লরেন্স, জেমস উটরাম, ডোনাল্ড ম্যাকলাউড, হেনরি মেরিয়ন ডুরাণ্ড, কলিন ম্যাকেঞ্জি, হারবার্ট বি. এডওয়ার্ডস,

জন ক্লার্ক মার্শম্যান, হেনরি সামনার মেন, হেনরি র‍্যামসে ও চার্লস ইউ. অ্যাটকিসন, এই বারো জন ভারতীয় 'স্টেট্‌সম্যানে'র যে জীবনী প্রকাশ করেন, তাহাতে জন মার্শম্যান প্রসঙ্গে এই ভূমিকা করেন :

"He was in some respects the most remarkable of them all. For more than fifty years he lived in India ; for nearly three quarters of the century he sacrificed himself for the good of its peoples. He was the colleague and successor of the Serampore brotherhood, Carey, Ward and Joshua Marshman, his father. He founded and long edited the first Bengali and English weekly journals in India. He worked incessantly for the education of the people in their mother-tongue and in English. He did more than any other single pioneer for Indian railways telegraphic communication with England and forestry....While guiding the Administration and the public of India alike by his experienced pen from the days of Lord Hastings to those of the present Earl of Northbrook, he wrote *The History of India* (1867) which is still the best and must remain the most anthoritative for the British Period."

অর্থাৎ "কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করিলে তাঁহাকেই এই দলের (বারো জনের) মধ্যে সর্বাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। অর্ধ শতাব্দীরও উর্ধ্বকাল তিনি ভারতবর্ষে বাস করিয়াছিলেন, শতাব্দীর তিন পাদ তিনি নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়া ভারতবাসীদের কল্যাণে নিযুক্ত ছিলেন , শ্রীরামপুরের ভ্রাতৃসংঘ—কেরী, ওয়ার্ড ও পিতা জোশুয়া মার্শম্যানের তিনি সহকর্মী ও উত্তরাধিকারী ছিলেন। ভারতবর্ষে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র সাপ্তাহিক ও একটি ইংরেজী সংবাদপত্র সাপ্তাহিক তিনি প্রতিষ্ঠা ও দীর্ঘকাল সম্পাদন করেন; মাতৃভাষায় ও ইংরেজীতে বাংলাদেশের লোকের শিক্ষাবিধানের জন্য তিনি অবিরত পরিশ্রম করেন। ভারতীয় রেলপথ[৬], ইংলণ্ডের সহিত টেলিগ্রাফিক সংযোগ এবং ভারতীয় বনসম্পদের জন্য তিনি একা যাহা করিয়াছিলেন, কোনও একজন প্রথম পথপ্রদর্শকের দ্বারা তাহা সম্পাদিত হয় নাই। ...তাঁহার অভিজ্ঞতাপ্রসূত লেখার দ্বারা (লর্ড হেষ্টিংসের আমল হইতে বর্তমান লর্ড নর্থব্রুকের আমল পর্যন্ত) শাসক ও শাসিত উভয় সম্প্রদায়ের পথনির্দেশ করিতে করিতে তিনি যে 'দি হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া' (১৮৬৭) রচনা করিয়াছিলেন, তাহা আজও পর্যন্ত ব্রিটিশ আমলের শ্রেষ্ঠ ইতিহাস এবং চিরকাল সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ইতিহাস হইয়া থাকিবে।" জর্জ স্মিথ ১৮১৮ সনে শ্রীরামপুর কলেজের প্রতিষ্ঠা ও দীর্ঘকাল পরিচালনায় জনের কৃতিত্বের কথা এই তালিকায় উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছেন।

এমন যে একনিষ্ঠ ভারতবন্ধু, ভারতবর্ষের মাটি তাঁহার শেষ আশ্রয় হয় নাই, ইহাই তাঁহার জীবনের সর্বাধিক ট্র্যাজেডি। গোড়ায় মাসিক এবং পরে ত্রৈমাসিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া', ১৮৩৫

৬ ১৮৬৮ সনের 'দি কোয়ার্টারলি রিভিউ' পত্রে ভারতবর্ষের তদানীন্তন রেলওয়ে সম্বন্ধে তিনি যে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ (Article II of No. 249, Vol. CXXXV) লিখিয়াছিলেন, তাহার ফলেই ভারতীয় রেলওয়ের বহু সংস্কার সাধিত হয়।

সনের ১লা জানুয়ারি বৃহস্পতিবার হইতে যখন জন ক্লার্ক মার্শম্যান কর্তৃক সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্রে রূপান্তরিত হয়, তখন সেই ১লা জানুয়ারির প্রথম সংখ্যায় তিনি তাঁহার প্রস্তাবনায় লেখেন, "The welfare of India, the country of our adoption though not of our birth, is the grand aim of our labour." "যে দেশে আমরা ভূমিষ্ঠ হই নাই, কিন্তু স্বভূমিরূপে যে দেশকে গ্রহণ করিয়াছি, সেই ভারতবর্ষের কল্যাণই আমাদের এই প্রচেষ্টার মহত্তম লক্ষ্য।" কিন্তু ভারতবর্ষের এই আত্মনিবেদিত সন্তান তাঁহার প্রিয়তম আবাসভূমি শ্রীরামপুরে শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই; তাঁহার পূজ্যপাদ পিতা জোশুয়া মার্শম্যান, স্নেহময়ী মাতা হ্যানা, সহোদরা সুসানা, প্রিয়তমা সহধর্মিণী মার্গারেট নোরা (মৃত্যু ১৫ই ডিসেম্বর ১৮৪৩), দুই শিশুকন্যা সুসানা লিডিয়া ও রোজামণ্ড নোরা এবং শিশুপুত্র আর্থার যে পুণ্য মৃত্তিকায় সমাধিস্থ হইয়া চিরবিশ্রাম লাভ করিতেছেন; যে মৃত্তিকায় তাঁহার ইহলোকের গুরু পিতৃবন্ধু উইলিয়ম কেরী, দীর্ঘকালের সহকর্মী খুল্লতাততুল্য উইলিয়ম ওয়ার্ড, জ্যেষ্ঠাগ্রজসম ফেলিক্স কেরী এবং পরবর্তী জীবনের নিত্য সহচর অনুজ জন ম্যাক নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন; যে মাটির উপর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ও পরিপুষ্ট কলেজ এখনও সগৌরবে দাঁড়াইয়া আছে; যেখানে আজিও তাঁহার সাধের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' ('স্টেটসম্যান') প্রতিদিন প্রাতে আত্মপ্রকাশ করে; সেখানে সেই মাটিতে তাঁহার সমাধির জন্য স্থান হয় নাই। এখনও গভীর বিচ্ছেদব্যথায় ইংলণ্ডের মাটিতে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের নশ্বর দেহাবশেষ যে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছে, যে কোনও সহৃদয় মানুষ কান পাতিয়া শুনিলে সে দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনিতে পাইবেন। মহাকবি মধুসূদনের মত তিনি যদি আপন সমাধিস্তম্ভের জন্য কোনও ছন্দোবন্ধ পরিচয় লিখিয়া যাইতে পারিতেন, তাহা হইলে আমরা ইংলণ্ডে তাঁহার সমাধিগাত্রে এই কল্পিত পংক্তি কয়েকটি উৎকীর্ণ দেখিতে পাইতাম:

দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে। তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে—
(মাতৃহীন শিশু যথা লভয়ে বিরাম
বিমাতার কোলে) হেথা মহানিদ্রাবৃত
মার্শম্যান-কুলোদ্ভব কর্মযোগী জন।
বঙ্গের শ্রীরামপুরে জাহ্নবীর তীরে
কর্মভূমি, জন্মভূমিসম; জন্মদাতা
ধীমান্ জোশুয়া নামে, মাতা হ্যানা সতী।

সংশোধন—৯০ পৃষ্ঠায় ২য় সংখ্যক ফুটনোটে "Higginbootham" স্থলে "Higginbotham" হইবে। ১০৪ পৃষ্ঠার নীচের দিক হইতে ৪র্থ পংক্তিতে "১৮১৮ সন পর্যন্ত" স্থলে "১৮১৭ সন পর্যন্ত" পড়িতে হইবে। ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির পুরাতন 'ক্যাটালগে' বাংলা পুস্তক-তালিকায় 'আগ্রিকলচরাল ও হর্টিকলচরাল সোসাইটির নিষ্পত্তি কার্য্যের বিবরণ পুস্তক। দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীরামপুর, ১৮৩৬' নামক বইখানির উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ মার্শম্যানের 'ক্ষেত্রবাগান বিবরণে'র ইহাই আসল নাম।—লেখক।

বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

পঞ্চদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত দেবীকে একটি বিশেষরূপে বাঙলা সাহিত্যে দেখিতে পাই বাঙলার মঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্যে। এই মঙ্গল-কাব্যগুলি বাঙলাদেশেরই একটি বিশেষ সম্পদ; কারণ, আমাদের মধ্যযুগের অন্যান্য যে-সব জাতীয় সাহিত্য রহিয়াছে তাহা অল্প-বিস্তর ভারতবর্ষের বিভিন্নাঞ্চলের সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যায়; কিন্তু মঙ্গল-কাব্য একমাত্র বাঙলা সাহিত্যেই পাওয়া যায়। এই বাঙলা মঙ্গল-কাব্যগুলি সংস্কৃত-পুরাণ হইতে অনেকাংশে পৃথক হইলেও কতকগুলি সাদৃশ্যও স্পষ্ট লক্ষণীয়। এই সাদৃশ্যগুলির মধ্যে একটা প্রধান সাদৃশ্য এই, আমরা দেখি, পুরাণগুলিতে বিশেষ বিশেষ কালে উদ্ভূত এবং স্বীকৃত এবং ক্ষুদ্রাঞ্চলে বৃহদঞ্চলে প্রচলিত খ্যাত, অল্পখ্যাত এবং অখ্যাত বহু দেবীগণকে নানা কাহিনী বা দার্শনিক ব্যাখ্যার সাহায্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধা এবং দার্শনিক-শক্তিতত্ত্বের দ্বারা প্রতিষ্ঠিতা এক মহাদেবীর সহিত যুক্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সব দেবীই যে এক আদিশক্তিরই দেশ-কাল-পাত্র-বিশেষ অবলম্বনে বিশেষ বিশেষ প্রকাশ মাত্র পুরাণকারগণের সকল কাহিনী ও তত্ত্বব্যাখ্যার ভিতর দিয়া এই সত্যটিরই প্রকাশ ঘটিয়াছে। সংস্কৃতভাষায় যে চেষ্টা দেখিলাম পুরাণগুলির মধ্যে বাঙলা-ভাষায় তাহারই একটি নূতন চেষ্টা দেখিতে পাই মঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্যে।

ত্রয়োদশ শতকে বাঙলায় বৈদেশিক বিজয়ের পরে অতি স্বাভাবিক ভাবেই সমাজের উচ্চকোটিতে প্রবর্তিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির উপরে একটি প্রবল আঘাত লাগিয়াছিল। ইহার ফলে যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহার পূরণ দেখিতে পাইলাম আবার অন্যভাবে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের উপরে আঘাতের সুযোগ লইয়া লৌকিক ধর্ম, সংস্কৃতি ও সাহিত্য মাথা নাড়া দিয়া জাগিয়া উঠিবার সুযোগ পাইল। ভাষা-সাহিত্য যখন গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিল তখন তাহার রচয়িতা শ্রোতা এবং সমজদার দেখা দিতে লাগিল সমাজের সর্বস্তরের জনগণের মধ্য হইতে। সেই সুযোগে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে যে-সকল দেব-দেবী ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে সংকুচিত হইয়া ছিলেন, নিম্নস্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিয়া অবজ্ঞাত ছিলেন, তাঁহারাও আস্তে আস্তে উপরের স্তরে ভাসিয়া উঠিয়া যতটা সম্ভব বিস্তার লাভের সুযোগ পাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই সব দেব-দেবীকে অবলম্বন করিয়া আঞ্চলিক সমাজে যে-সকল কিংবদন্তী ও লৌকিক কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাও ভাষা-সাহিত্যের বিষয়বস্তু হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। ত্রয়োদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাঙলাদেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে এবং সমাজ-জীবনের বিভিন্ন স্তরে যে সকল দেবী আত্মগোপন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইয়াছে দুই ভাবে; প্রথমতঃ উচ্চকোটিতে স্বীকৃতি লাভ করিয়া, দ্বিতীয়তঃ

ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়া। ইহা কি ভাবে সম্ভব হইতে পারে? ইহা সম্ভব হইতে পারে সেই বিশেষ বিশেষ দেবীগণের নিজস্ব শক্তির মহিমা জ্ঞাপন করিয়া, আর উচ্চকোটি নিম্নকোটি সর্বকোটিতে ব্যাপকভাবে স্বীকৃতা যে মহাদেবী তাঁহার সহিত এই দেবীগণের অভিন্নতা সম্পাদন করিয়া। এই তুই দিকের চেষ্টাই আমরা লক্ষ্য করিতে পারি মঙ্গল-কাব্যগুলিতে। সেখানে বিবিধ উপাখ্যানের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ দেবীর অবাধ অনুগ্রহ-নিগ্রহের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেবমহিমা তো প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেই, পরন্তু দেবী যে শেষ পর্যন্ত আদিশক্তি মহাদেবীরই বিশেষ মূর্তিমাত্র, অতএব আদিশক্তি মহাদেবীর সহিত একান্তভাবে অভিন্না, এই সত্যও প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা দেখিতে পাই।

আমরা পূর্বে লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি, কি করিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের আদিদেবী স্বষ্টিতত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া আমাদের মঙ্গল-কাব্যগুলিতে আদি-শক্তিরূপে মহাদেবী পার্বতী চণ্ডিকার সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। এই পার্বতী চণ্ডিকাই মঙ্গল-কাব্যের যুগে দেবীরূপে সর্বকোটিতে এবং সর্বঅঞ্চলে স্বীকৃতা ছিলেন; তাই তিনিই মহাদেবী—তাঁহার সহিত অন্য সব দেবীগণকে মিলাইয়া লইবার চেষ্টা। মনসা-মঙ্গলের 'মনসা' দেবী যে কোনও প্রাচীন বহুপ্রচারিতা পৌরাণিক দেবী নহেন এ-কথা আজ আর নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই; সর্পদেবীরূপে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসিদ্ধা একজন লৌকিক দেবী। মনসা-মঙ্গলে তাঁহার কত মহিমাই কতভাবে প্রচারের চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু তথাপি শেষ পর্যন্ত দেখিতে পাই দেবী 'স্বে মহিম্নি' প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই। বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গলে[১] দেখি, চাঁদ সদাগরের সপ্ত পুত্র জিয়াইয়া এবং চৌদ্দ ডিঙা উদ্ধার করিয়া চম্পক নগরীতে ফিরিয়া আসিয়া বেহুলা যখন চাঁদ সদাগরকে একবার মাত্র মনসাকে পূজা দিবার অনুরোধ জানাইয়াছিল তখনও চাঁদ সদাগর বলিয়াছিল—

ধনে জনে কার্য নাই যাউক আর বার।
পদ্মা না পূজিব আমি কহিলাম সার॥

বেগতিক দেখিয়া তখন হর-জায়া চণ্ডীর নিজেকে আকাশ হইতে চাঁদ সদাগরকে ডাকিয়া দৈববাণী করিতে হইল—

পদ্মাবতী পূজা কর চান্দ সদাগর।
একই মূর্তি দেখ সব না ভাবিও আর॥
... ...
যেই জান ভগবতী সেই বিষহরি।
পদ্মার প্রসাদে আমি ভবসিন্ধু তরি॥

এই দৈববাণী শুনিয়াই চাঁদ সদাগরের সর্বদেবীতে 'এক' বুদ্ধি আসিল এবং সদাগর মনসা পূজায় স্বীকৃত হইল। কবি তাঁহার কাব্যের প্রথমদিকে একটি বিরাট অংশ জুড়িয়া

---

১. প্যারীমোহন দাশগুপ্তের সংস্করণ।

পদ্মবনে শিব-দুহিতা মনসার প্রতি চণ্ডীর বিমাতাজনোচিত যে অশেষ দুর্ব্যবহারের বর্ণনা করিয়াছেন এবং স্বভাবকোপনা সর্পদেবী মনসার চণ্ডীকে দংশনের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহার সহিত পরবর্তী এই 'ঐক্যে'র কোনও সংগতি নাই। কিন্তু এই ঐক্য কোন সংগতি-জাত নহে, আদিশক্তির একত্ব সম্বন্ধে একটি দৃঢ়সংস্কারজাত। এই কারণেই দেখিতে পাই চাঁদ সদাগর যখন মনসার পূজা অন্তে মনসার স্তুতি করিতেছে তখন বলিতেছে—

নমোনমঃ জগৎমাতা সর্বসিদ্ধিদায়িনী।
তুমি সূক্ষ্ম তুমি মোক্ষ তুমি বিশ্বজননী॥
তুমি জল তুমি স্থল চরাচরবন্দিনী।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি তুমি মূলধারিণী॥

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসা-মঙ্গলেও[৩] দেখিতে পাই চাঁদ সদাগর মনসার স্তবে বলিতেছে—

আদ্যাশক্তি সনাতনী মুক্তিপদ প্রদায়িনী
জগতপূজিতা তুমি জয়া।
যার সৃষ্টি ত্রিভুবন হর মহেশের মন
আর কে বুঝিবে তব মায়া॥

কবি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, মনসার কেতকবনে শিববীর্যে জন্ম; শিব-কন্যার সম্বন্ধে 'হর মহেশের মন' বলা সংগত নহে। কিন্তু সেই শিব-দুহিতা পরিচয় কি শুধু চাঁদ সদাগর ভুলিয়াছে? দেবী নিজেও ভুলিয়াছেন। নিজের পরিচয় দিয়া তিনি চাঁদ সদাগরকে বলিতেছেন—

আকাশ পাতাল ভূমি সৃজন সকল আমি
শক্তিরূপা সভাকার মাতা।
মহেশের মহেশ্বরী মনোরূপা সুকুমারী
লক্ষ্মীরূপা নারায়ণ যথা॥

শুধু মনসাই যে মূল শক্তিরূপা হইয়া মহেশ্বরী হইয়া গিয়াছেন তাহা নয়, শীতলা, ষষ্ঠী, কমলা, বাশুলী প্রভৃতি বাঙলাদেশে প্রচলিত সকল দেবীই মূলে শক্তিরূপা—সুতরাং মঙ্গল-কাব্যে তাঁহারা সকলেও মহেশ্বরী। কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'ষষ্ঠী-মঙ্গলে'[৪] দেখিত পাই, আসলে ষষ্ঠীও দুর্গা; দুর্গা ষষ্ঠীরই নামভেদ মাত্র।

দুর্গা নামে ষষ্ঠী পূজি আশ্বিনে আনন্দ।
যেই বর মাগে পায় তার নাই সন্দ॥

ঐ কবি রচিত 'শীতলা-মঙ্গলে'[৪] ও শীতলার 'চৌতিশা' স্তব দেখিতে পাইতেছি। সেই স্তবে দেখি—

---

২. শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত।
৩. ডক্টর সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। ৪. —ঐ

দুর্গা দুর্গা পারা দক্ষমক্ষ হারা
দুর্গতি রাখহ দীনেরে।
... ...
মস্তকমালিনী মুকুটধারিণী
মহিষমুণ্ডনাশিনী।
... ...
বিধিবিষ্ণু মায়া বিধি-বিষ্ণুপ্রিয়া
বরণমই বিষ্ণুধাতা।
সংখিনী শূলিনী সংকর গৃহিণী
শৈলসুতা শিবদাতা॥

কবি কৃষ্ণ-রাম রচিত 'কমলা-মঙ্গলে'র প্রারম্ভে দেখিতে পাই কমলা ব্যাঘ্রভয়-নিবারিণী দেবী। দক্ষিণা রায়কেই আমরা ব্যাঘ্রের দেবতা জানি; কমলা লক্ষ্মী রূপেই কি করিয়া ব্যাঘ্রভয়-নিবারিণী হইলেন বোঝা যায় না।[৫] কিন্তু বিপন্ন 'সাধু' কর্তৃক এই কমলার বর্ণনায়ও দেখি—

সদাগর বলে রাজা শুন এই হিত।
লক্ষ্মীর চরণ ভাব হইয়া এক চিত॥
সকলের শক্তি তিনি জগতের মাতা।
সত্বরে কহিনু রাজা এই সত্য কথা॥

রাজাও কমলাব স্তব করিয়া বলিলেন—

জগত জননী তুমি সনাতনী একা।
সদয় হইয়ে নিজ রূপ দিয়া দেখা॥

৫. এ-বিষয়ে কতকগুলি লক্ষণীয় তথ্যের উল্লেখ করিতেছি। পূর্ববঙ্গে দেখিয়াছি, চৈত্র-সংক্রান্তির কিছুদিন পূর্বে গ্রামের লোক (সাধারণতঃ নিম্নজাতির) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বাঁধিয়া গান গাহিয়া রাত্রিতে ভিক্ষায় বাহির হয়। এই ভিক্ষাকে বলা হয় 'কুলাইর ভিখ'; 'ঠাকুর কুলাই ভো' বলিয়া প্রথমে ও শেষে ধ্বনি করা হয়। এই গানের প্রথম ছড়াটি হইল—'আইলাম লো স্মরণে। লক্ষ্মীদেবীর বরণে॥ লক্ষ্মীদেবী দিবেন বর। ধানে চাউলে ভরুক ঘর॥' ইত্যাদি। পৌষে ফসল ঘরে তুলিবার পরে ইহা শস্যদেবী লক্ষ্মীর গান সন্দেহ নাই। এই লক্ষ্মী-বন্দনার পরই দেখিতে পাইতাম 'বারো বাঘের লেখাপড়ি', অর্থাৎ বারো রকমের বাঘের উল্লেখ করিয়া ছড়ায় তাহাদের আকৃতি-প্রকৃতি বর্ণনা। পৌষের শীতের সময়েই সর্বত্র বাঘের ভয় দেখিতাম, এই সময়েই বাঘ বন ছাড়িয়া শিকারলোভে লোকালয়ে ঢুকিয়া পড়িত। শস্যরূপিণী লক্ষ্মী বা কমলার সহিত এইভাবেই কি ব্যাঘ্রের সম্পর্ক দেখা দিয়াছে?

সকল তোমার মায়া আর কার নয়।
প্রতিজ্ঞায় হারিনু সাধুর হইল জয়॥
... ...
ব্রহ্মা বিষ্ণু হর যারে নিত্য পূজা করে।
তাহারে করিতে স্তব কোনজন পারে॥

অন্যত্রও দেখি—

কৃপাময়ী জগতি বিষ্ণুর জায়া।
যত দেখি সকলি ঐ জননীর মায়া॥
... ...
পরম ঈশ্বরী ইনি জগতের মা॥
... ...
নীলায় (লীলায়) অসুরকুল বধিয়ে প্রবল।
তাহাতে কোথায় আছে মনুষ্য সকল॥

এই কমলা-দেবীর স্বর্ণমন্দির নির্মাণ করাইয়া যখন দেবীর পূজা দেওয়া হইল তখন—

এক শত ছাগ বলি বাছিয়া ধবল।
রুধির খর্পর ভরি ভকতি করিল॥

সুতরাং লক্ষ্মী হইলেও তিনি চণ্ডী-চামুণ্ডার সহিত ঐক্যে রক্ত-লোলুপা।

বাঙলা মঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্যে দেবীকে প্রধান করিয়া পাইতেছি চণ্ডী মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে। চণ্ডী-মঙ্গলগুলির মধ্যে আমরা যে দেবীর সাক্ষাৎলাভ করিতেছি তাঁহার সাধারণ নাম মঙ্গল-চণ্ডিকা। এই মঙ্গল-চণ্ডিকা যে মূলে পৌরাণিক চণ্ডিকার সহিত অভিন্না নন, ইনি যে বাঙলাদেশের একজন লৌকিক দেবী এ-কথা পূর্বে অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন।[৬] মঙ্গল-চণ্ডিকার পৌরাণিক চণ্ডিকার সহিত অভিন্নতালাভের ইতিহাসই দেখিতে পাই আমরা এই চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যগুলিতে। মূলে দেবীর নাম মঙ্গল চণ্ডিকা ছিল না বলিয়াই মনে হয়, মূলে তিনি সম্ভবতঃ ছিলেন মঙ্গলা, বা সর্বমঙ্গলা বা অষ্টমঙ্গলা; উপপুরাণগুলির মধ্যেই তিনি মঙ্গল-চণ্ডী হইয়া উঠিয়াছেন। অবশ্য পৌরাণিক চণ্ডিকা দেবীও বহুস্থলে মঙ্গলময়ী বলিয়া কীর্তিতা; মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর মধ্যেই তাঁহাকে আমরা 'সর্ব-মঙ্গল-মঙ্গল্যে' ও 'শিবে' বলিয়া সম্বোধিত হইতে দেখি; মঙ্গলময়ী এই অর্থে তাঁহার 'শিবা' বর্ণনা বহুবার দেখিতে পাই। প্রসিদ্ধ অর্গলা-স্তোত্রের মধ্যেও দেবীকে 'মঙ্গলা' বলা হইয়াছে। দেবীর 'মঙ্গলা' বা 'শিবা' নাম বা বিশেষণ অন্যান্য পুরাণেও পাওয়া যায়। কিন্তু তথাপি মনে হয় মঙ্গলাদেবী একজন স্থানীয় লৌকিকদেবী। দেবী-পুরাণ, দেবী-ভাগবত, বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ, ব্রহ্ম-বৈবর্তপুরাণ (বঙ্গবাসী সংস্করণ, যাহার অনেকাংশই অর্বাচীন) প্রভৃতিতে

---

৬. এ-প্রসঙ্গে শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'বাংলা মঙ্গল-কাব্যের ইতিহাস' দ্রষ্টব্য।

মঙ্গল-চণ্ডিকাদেবীর নানাভাবে উল্লেখ দেখিতে পাই। এইসব অর্বাচীন পুরাণ-উপপুরাণকারগণ দেবীর 'মঙ্গলা' নামের এতখানি প্রসিদ্ধির কারণ সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন না; দেবী যে মঙ্গলকারিণী বলিয়া 'মঙ্গলা' এই সাধারণ এবং সহজ ব্যাখ্যা সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন; তাহার পরে দেবীকে মঙ্গলবার, মঙ্গলগ্রহ, মঙ্গল দৈত্য, মঙ্গল নৃপতি, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নরগণ—সর্ববিধ মঙ্গলের সঙ্গেই যুক্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এ-বিষয়ে ব্রহ্ম-বৈবর্তপুরাণ[৭] এবং দেবী-ভাগবতে ঠিক একই বর্ণনা দেখিতে পাই। বেশ বোঝা যায় 'মঙ্গলা' নাম দেখিয়াই যেখানে যাহা মঙ্গল নামযুক্ত তাহার সহিতই দেবীর যোগ দেখান হইয়াছে।

আসলে 'মঙ্গলা' দেবী হইলেন বাঙলা দেশের মেয়েদের ব্রতের দেবী। পৌরাণিক দেবীগণ ব্যতীত আমাদের দেশে মেয়েদের ব্রতের বহু দেবী ছিলেন এবং এখনও আছেন। জ্যোতিষে মঙ্গলা, পিঙ্গলা, ধন্যা, ভ্রামরী, ভদ্রিকা, উল্কা, সিদ্ধি ও সঙ্কটা এই অষ্ট দেবীকে অষ্টযোগিনী বলা হইয়াছে।[৮] ইহার মধ্যে ভ্রামরীর মহাদেবীত্ব তো চণ্ডী-সপ্তসতীতেই স্বীকৃত। মঙ্গলার ব্রত এবং সঙ্কটার ব্রত এখন পর্যন্ত হিন্দু-নারীদের মধ্যে প্রচলিত। প্রতি মঙ্গলবারে উপবাস করিয়া মঙ্গলার ব্রত করিতে হয়। সঙ্কটার ব্রতও মেয়েরা উপবাস করিয়াই এখনও করিয়া থাকেন। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয়, এখন পর্যন্তও এই সকল দেবীদের কোনও পূজার প্রচলন নাই—মেয়েদের ব্রতেই তাঁহারা আরাধ্যা। এই সকল দেবাদের যোগিনী বলিবার তাৎপর্য এই মনে হয়, শাস্ত্রকারগণ ইঁহাদিগকে রমণীগণের ব্রতে বা অন্যভাবে আরাধিতা হইতে দেখিয়াছেন, অথচ মূল মহাদেবী দুর্গা বা চণ্ডীর সহিত অভিন্নত্বের মর্যাদা তখনও দিতে প্রস্তুত হন নাই, তাই ইঁহাদিগকে যোগিনী-জাতিভুক্ত করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। এই মঙ্গলা বা সর্বমঙ্গলা দেবীকে যে ব্রহ্ম-বৈবর্ত পুরাণে ও দেবী-ভাগবতে 'যোষিতামিষ্টদেবতা' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় লক্ষ্য করিয়াছেন।[৯] এই বর্ণনার ভিতর দিয়াই আসল সত্য প্রকাশিত হইয়াছে।

বাঙলা চণ্ডী-মঙ্গলের ভিতরে দ্বিজ মাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীতে'র[১০] মধ্যে এবং দ্বিজ রামদেব বিরচিত 'অভয়ামঙ্গলে'র[১১] মধ্যে আমরা মঙ্গল-চণ্ডী কর্তৃক মঙ্গল-দৈত্য বধের কাহিনী দেখিতে পাই। কিছু কিছু পুরাণ-উপপুরাণের মধ্যেই মঙ্গল দৈত্যের উল্লেখ রহিয়াছে এ কথার

---

৭. ব্রহ্ম-বৈবর্ত পুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড, ৪৪ অধ্যায়; দেবী ভাগবত, ৯।৪৭ অধ্যায়; দেবী-পুরাণ, ৪৫ ও ৫০ অধ্যায়।

৮. মঙ্গলা পিঙ্গলা ধন্যা ভ্রামরী ভদ্রিকা তথা।
উল্কা সিদ্ধিঃ সঙ্কটা চ যোগিন্যোঽষ্টাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥—শব্দ-কল্পদ্রুমে ধৃত।

৯. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ৩য় সং, ৩৪৭-৪৮ পৃষ্ঠা।

১০. শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। ১১. ডক্টর আশুতোষ দাস সম্পাদিত।

উল্লেখ আমরা পূর্বেই করিয়াছি। পুরাণ-উপপুরাণের সেই ইঙ্গিত অবলম্বন করিয়াই পূর্ববঙ্গের এই কবিদ্বয় মঙ্গল-দৈত্য বধের কাহিনী গড়িয়া লইয়াছেন। দেবী কর্তৃক দৈত্য-বধের কাহিনী-রচনায় কোনও অসুবিধা নাই, কারণ দৈত্য হইলেই সে একবার স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করিয়া দেবতাগণকে নির্যাতিত করিবেই; নির্যাতিত দেবগণ শেষ অবধি অগতির গতি সর্বশক্তিময়ী দেবীর শরণ গ্রহণ করিবেনই এবং দেবীর তো দৈত্য বধ করিয়া অসহায় দেবগণকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি রহিয়াছেই, অতএব দেবগণের শরণমাত্র দেবী আসিয়া মঙ্গল-দৈত্যকেও বধ করিলেন। মঙ্গল-দৈত্যের কাহিনী রচনায় দ্বিজ মাধব ও দ্বিজ রামদেবের মধ্যে ঐকমত্য রহিয়াছে। মুকুন্দরামের মধ্যে এই কাহিনী নাই।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিতে পারি যে ওড়িয়্যার শাক্ত কবি সারলা দাস তাঁহার বিলঙ্কা-রামায়ণ এবং চণ্ডী-পুরাণ কাব্যে বহুভাবে সর্বমঙ্গলার উল্লেখ করিয়াছেন; সর্বমঙ্গলা রূপেই যেন দেবীর প্রধান পরিচয়। কিন্তু এই সর্বমঙ্গলা যে মূলে একজন উপদেবী ছিলেন তাহা এই চণ্ডী-পুরাণের একটি কাহিনীতেই স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। 'চণ্ডী-পুরাণে'র শেষে দেখিতে পাই যে মহিষাসুরকে যখন দেবী কিছুতেই বধ করিতে পারিতেছিলেন না, তখন দুর্গার সহচারিণী মনোরমা দুর্গা দেবীকে বিবসনা কালীরূপ ধারণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন; সেই উপদেশে বিবসনা কালীরূপ ধারণ করিয়া দুর্গা মহিষাসুর নিধন করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। দুর্গাকে এই উপদেশ দান করার জন্য এই সহচারিণী দেব-মনুষ্য সকলের সর্বাপেক্ষা মঙ্গলকারিণী বলিয়া গৃহীতা হইলেন এবং দুর্গা বলিলেন—

সমস্ত সুলভ হেব তোর পরসাদে।
সর্বমঙ্গলা নাম তোহর হেউ হাদে॥

বাঙলা চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যের মধ্যে আমরা দুইটি উপাখ্যান দেখিতে পাই। একটি কালকেতু ব্যাধের উপাখ্যান, অপরটি ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান। ইহার মধ্যে ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানটি বিশ্লেষণ করিলেই আমরা যোষিৎগণ-সেবিতা সর্বমঙ্গলা বা মঙ্গলা দেবীর স্বরূপের অনেকখানি সন্ধান পাইব।

চণ্ডী-মঙ্গলের কবিগণের মধ্যে যোড়শ শতাব্দীর সমসাময়িক দুইজন কবি দ্বিজ মাধব এবং মুকুন্দরামই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। পূর্ববর্তী কবি বলিয়া মুকুন্দরাম মাণিক দত্তের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়াছেন; এই মাণিক দত্তের চণ্ডী-মঙ্গলের যে সংস্করণটি মুদ্রিত আছে তাহার প্রাচীনত্ব এবং প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। দ্বিজ মাধবের চণ্ডী-মঙ্গলের ধনপতি উপাখ্যানে দেখিতে পাই, সপত্নী লহনা কর্তৃক বনে ছাগল চরাইবার কাজে নিয়োজিত হইয়া ধনপতি সদাগরের দ্বিতীয়া পত্নী খুলনা গহন বনে ছাগল চরাইতেছিল, একটি ছাগল দেবীর চক্রান্তে হারাইয়া গেল। ত্রাসযুক্ত হইয়া খুলনা বনে ছাগল অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিল। দেবীর লীলাসহচরী ছিলেন পদ্মা। বাঙলার সব মঙ্গল-কাব্যের মধ্যেই প্রত্যেক দেবীর একটি লীলাসহচরী দেখিতে পাই; ইনি মূল দেবীর সম্পদে-বিপদে পরামর্শদাত্রী এবং পূজাপ্রচারের সহায়কারিণী। চণ্ডী-মঙ্গলগুলিতে চণ্ডীর সহচরী দেখিতে

পাই পদ্মা; মনসা-মঙ্গলগুলিতে মনসার সহচরী দেখি নেতা ধোপানী; কমলা-মঙ্গলে কমলার সহচরী নীলাবতী; সহজিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যে 'নিত্যা'র সহচরী (বা ডাকিনী) বাসুলী; ধর্মমঙ্গলে ধর্মঠাকুরের সহচর এবং বুদ্ধিদাতা হইলেন উলুক। যাহা হোক, দেবী-সহচরী পদ্মা বনমধ্যে গিয়া জয়ধ্বনি (হুলুধ্বনি?) দিয়া দেবীর ঘট পাতিয়া পূজা আরম্ভ করিয়া দিল; খুলনা শব্দ শুনিয়া তাহার ছাগল ঐ দিকে মনে করিয়া অগ্রসর হইল, দেখিল পঞ্চকন্যা (পদ্মা-সহ?) সেই বনে বসিয়া দেবীর পূজা করিতেছে। পঞ্চকন্যার মুখপাত্র পদ্মা খুলনাকে ভরসা দিল, বনে বসিয়া দেবীর পূজা করিলে সে তাহার হারানো ছাগল খুঁজিয়া পাইবে। খুলনা তখনই নদীর জলে স্নান করিয়া শুচিশুদ্ধ হইয়া পদ্মা-কথিত বিধানে দেবীর পূজা-অর্চা করিয়া দেবীর বর লাভ করিল। বন-মধ্যে বসিয়া পঞ্চ-কন্যার কথিত-বিধানে যে দেবীর পূজা-অর্চা তাহা কোনও পৌরাণিক দেবীর আনুষ্ঠানিক পূজা-অর্চা নয়—ইহা মেয়েলি ব্রত বলিয়াই মনে হয়। বাড়িতে বসিয়াও খুলনা ঘট পাতিয়া গোপনে দেবীর পূজা করিয়াছিল, শিব-উপাসক ধনপতি সদাগর লাথি মারিয়া সেই মেয়েলি দেবতার ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল।[১২]

মঙ্গল-চণ্ডীর পূজা যে মূলে মেয়েলি ব্রত মুকুন্দরামের চণ্ডী-মঙ্গলে সে কথাটা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মুকুন্দরাম-রচিত ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানের মধ্যে দেখিতে পাই, উপাখ্যান আরম্ভের প্রথমেই একেবারে স্পষ্টোক্তি—

স্ত্রীলোকের পূজা লৈতে চণ্ডী কৈল মতি।
পদ্মাবতী সনে মাতা করিলা যুকতি ॥[১৩]

স্ত্রীলোক কর্তৃক পূজা প্রচারের মানসে স্বর্গ-নর্তকী রত্নমালাকে তালভঙ্গ-দোষে শাপ দিয়া দেবী যখন মর্ত্যে আনিবার ব্যবস্থা করিলেন তখন রত্নমালাও স্পষ্ট বলিল—

ক্ষমহ আমার দোষ   হও মোরে পরিতোষ
কৃপাময়ি কর অবধান।
অবনী-মণ্ডলে যাব   তোমার কিঙ্করী হব
করাইব ব্রতের বিধান ॥

বনে খুল্লনার (মুকুন্দরাম খুল্লনা নামই ব্যবহার করিয়াছেন) ছাগল হারাইবার উপাখ্যানে মুকুন্দরামের বর্ণনায় দেখি বনে ছাগল খুঁজিতে খুঁজিতে শ্রান্ত হইয়া খুল্লনা

---

১২. লক্ষ্য করিতে হইবে চাঁদ সদাগরের পত্নী সনকাও এমনই লুকাইয়া ঘটে মনসার পূজা করিয়াছিল, শিব-উপাসক চাঁদ সদাগর লাথি মারিয়া সেই ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। ফলে দেবীর রোষে ধনপতি সদাগরের যে দশা হইয়াছিল, চাঁদ সদাগরেরও সেই দশা হইয়াছিল।

১৩. বঙ্গবাসী সংস্করণ।

তরুতলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, দেবী স্বপ্নে খুল্লনাকে ছাগল ফিরিয়া পাইবার জন্য দেবীর ব্রত করিবার উপদেশ দিলেন। তখন—

এমন স্বপন দিয়া দেবী মহেশ্বরী।
নিজ ব্রতে নিয়োজিল অষ্ট বিদ্যাধরী॥
বিদ্যাধরীগণ ব্রত করে সরোবরে।
ছেলি লুকাইয়া মাতা রহিল অন্তরে॥

ব্রতকারিণী দেবকন্যাগণ খুল্লনার নিকটে আত্ম-পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছিল—

আমরা ইন্দ্রের সুতা এ পাঁচ ভগিনী।
করিতে চণ্ডীর ব্রত আইলাম অবনী॥
... ...
পূজিবে অম্বিকা প্রতি মঙ্গলবাসরে।
বিপদ্-সাগরে চণ্ডী হইবে কাণ্ডারে॥
... ...
এই ব্রত কৈলে তোমার আসিবেন পতি।
পতির প্রেমেতে তুমি হবে পুত্রবতী॥
লহনা জানিবে তোরে প্রাণের সমান।
হারাণ ছাগল পাবে ইথে নাহি আন॥

দেবী স্বয়ং খুল্লনাকে বলিয়াছেন—

অষ্টতণ্ডুল দূর্বা নিত্য নিরমিয়া।
পূজিও মঙ্গলবারে জয় জয় দিয়া॥

এইখানেই 'মঙ্গলা' পূজার স্বরূপ প্রকাশ, অষ্টতণ্ডুল দূর্বা দিয়া মঙ্গলবারে মেয়েরা মিলিয়া হুলুধ্বনি সহকারে দেবীর ব্রত করে। এই অষ্টধান্যদূর্বার 'মঙ্গলা' দেবীই 'অষ্টমঙ্গলা'; অষ্টমঙ্গলার গান যাঁহারাই রচনা করিয়াছেন তাঁহারাই আটদিন ধরিয়া গাহিবার মত পালা রচনা করিয়াছেন। দিনে (দুই বেলায়) দুইটি করিয়া পালা, আট দিনে মোট ষোলটি পালায় সব গান বিভক্ত। দেবী এখানে ব্রতের বিধান নির্দেশ করিয়া বলিলেন—

আরে ঝিয়ে খুল্লনা মাঙ্গিয়া লহ বর।
যেই বর চাহ দিব অরণ্য ভিতর॥

দেখা যাইতেছে যে খুল্লনা বনে ছাগল চরাইতে গিয়া অন্যান্য মেয়েদের ব্রত করিতে দেখিয়া ব্রত শিখিয়া আসিল। ঘরে বসিয়া প্রতি মঙ্গলবারে সে গোপনে এই সর্বমঙ্গলার ব্রত করিত। স্বামী ধনপতি সদাগর বাড়ি ফিরিয়া আসিলে খুল্লনার বিরুদ্ধে স্বামীকে উত্তেজিত করিবার মানসে সপত্নী লহনা সাধুকে গোপনে গিয়া বলিয়াছিল—

সদাগর, তোমায় আমায় আছে কিছু বিরল কথা।
তোমার মোহিনী বালা শিক্ষা করে ডাইনি কলা
নিত্য পূজে ডাকিনী দেবতা॥

হেম ঝারি জলগর্ভা উপরে দীঘল দূর্বা
অষ্ট শালিতণ্ডুল অন্তরে।
মস্তকে চন্দন চুয়া, কুঙ্কুম কস্তূরী গুয়া
পূজে প্রতি মঙ্গল বাসরে ॥
আমান্ন নৈবেদ্য দধি ফল পুষ্প নানাবিধি
অগুরু চন্দন ধূপ ধুনা।
দিয়া জয় শঙ্খ-ধ্বনি বধূ পূজে একাকিনী
বন্ধুজনে করে কাণাঘুণা ॥

বাঙলা দেশের ত্রয়োদশ চতুর্দশ পঞ্চদশ শতকে এই সব সদাগর বণিক-সম্প্রদায়ই সমাজপতি ছিলেন। আর ইঁহারা ছিলেন শৈব। চাঁদ সদাগর যেমন শূলপাণিকে ছাড়িয়া 'লঘুজাতি কানি'—অর্থাৎ সমাজের অতি নিম্নস্তর হইতে উদ্ভূতা ঐ মনসা দেবীকে কিছুতেই পূজা করিতে চাহেন নাই, ধনপতি সদাগরও তেমনই সিংহলের বন্দীশালায় বসিয়া বলিয়াছিলেন—

যদি বন্দীশালে মোর বাহিরায় প্রাণী।
মহেশ ঠাকুর বিনা অন্য নাহি জানি ॥

এই সমাজপতি শৈব সদাগরের নিকটে স্বীকৃতি লাভ করিতে মেয়েলি ব্রতের দেবী সর্বমঙ্গলাকে পৌরাণিক হর-গৃহিণী পার্বতী চণ্ডিকার সহিত এক এবং অভিন্না হইয়া উঠিতে হইয়াছে। মেয়েলি 'মঙ্গলা' দেবী চণ্ডিকার সহিত অভিন্না হইয়াই নাম গ্রহণ করিলেন 'মঙ্গল-চণ্ডিকা'। তৎকালীন সমাজ-ধর্মের মধ্যে সেই মেয়েলি লৌকিক ধর্মের যে ক্রমপ্রাধান্য লাভ তাহারই লৌকিক ইতিহাস মঙ্গলকাব্যের এই কাহিনীর মধ্যে নিহিত।

চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় কাহিনী হইল কালকেতু ব্যাধের কাহিনী। আমরা আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গে ইহাকে দ্বিতীয় কাহিনী বলিতেছি; চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যগুলিতে এই কাহিনীই প্রথম কাহিনী। কালকেতু-কাহিনীর মধ্যে আবার দেখিতেছি, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ শতকে বাঙলা দেশের অতি মিশ্র-প্রকৃতির হিন্দুধর্মের মধ্যে ব্যাধ-জাতীয় আদিম জাতিগুলির মধ্যে প্রচলিত দেবীগণও কি করিয়া সমাজের উচ্চস্তরের মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করিয়া উচ্চস্তরে স্বীকৃতা চণ্ডীদেবীর সহিত অভিন্না হইয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্য দিয়া চণ্ডীদেবীর মর্ত্যে পূজা প্রচারের ইতিহাস দেখি না, সে ইতিহাস তো সংস্কৃতে লিখিত পুরাণগুলির মধ্যেই দেখিয়া আসিয়াছি। এখানে দেখিতেছি নীচ ব্যাধ জাতির মধ্যে প্রচলিতা দেবীর মর্ত্যে পূজা-প্রচারের ইতিহাস। এই ইতিহাস আসলে বাঙলা দেশের একটা সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস। বাঙলার রাঢ় অঞ্চল আজিও বহু প্রকারের আদিম-অধিবাসি-অধ্যুষিত। এই আদিম অধিবাসিগণের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে। সেই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়া বাঙলার জাতীয় জীবনের ভিতরে তাহারা যেমন যেমন অবিচ্ছেদ্য অংশ বা উপাদান বলিয়া স্বীকৃত হইতে লাগিল তাহাদের দেব-দেবীগণও

তেমনই উচ্চকোটি হিন্দুগণের দেব-সমাজেও স্বীকৃতি লাভ করিতে লাগিলেন। সেই স্বীকৃতি লাভের ভিতর দিয়াই আদিম-অধিবাসিগণের দেব-দেবীও পৌরাণিক দেব-দেবীগণের সঙ্গে নানাভাবে অভিন্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

কালকেতু ব্যাধের উপাখ্যানে সেই সমাজবিবর্তন ও তদনুচারী ধর্মবিবর্তনের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। কালকেতু রাঢ় অঞ্চলের একটি পশু-হিংসক অতি নীচ জাতির লোক; পুরুষানুক্রমে তাহাদের পুরুষেরা গভীর বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া তীর-ধনুক-পরশু দ্বারা পশু শিকার করিত, আর মেয়েরা সেই পশুর মাংস, চামড়া, নখ-দন্ত প্রভৃতি বাজারে বিক্রী করিত। এই তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এই-জাতীয় একটি ব্যাধের চিরকাল দরিদ্র থাকিবারই কথা; কিন্তু কালকেতু তাহার মধ্যে ব্যতিক্রম—তাহার অমিত দেহশক্তি তাহাকে প্রচুর ধনের বর দান করিল। ধন-সম্পত্তির মালিক হইয়া সে বন্য প্রদেশের মধ্যেই রীতিমত নগর পত্তন করিয়া বসিল। শিয়রেই ছিল সামন্তরাজ, 'শিয়রে কলিঙ্গরাজা বড়ই দুর্বার' (মুকুন্দরাম); তিনি প্রথমে ইহা কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিলেন না; কি করিয়াই বা বরদাস্ত করেন—

পশু বধি ভ্রমে বন অকস্মাৎ পাইয়া ধন
গুজরাট হৈল হেমময়। (দ্বিজ রামদেব)

লঘুর এই হঠাৎ বাড়বাড়ন্ত নিতান্তই অসহ্য; তাই প্রতিপত্তিশালী উদীয়মান ব্যাধসর্দার কালকেতুকে শায়েস্তা করিবার জন্য তিনি সর্বশক্তি প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়ত বুঝিতে পারিলেন, অর্থনৈতিক পরিবর্তনহেতু এই যে সমাজ-পরিবর্তন ইহাকে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করিতেই হইবে; তাই কালকেতুকে নানাভাবে বিপর্যস্ত এবং লাঞ্ছিত করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাহার সঙ্গে একটা বনিবনা করিয়া লইতেই হইল।

কালকেতু অর্থলাভ করিয়াই সমাজ-স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে নাই; প্রথমে সে বন কাটিয়া পত্তন করিল যে নগরের বর্ণহিন্দুসমাজ সে নগরের অধিবাসী হইতে স্বীকার করে নাই। তখন তাই মণ্ডলের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তাহাকে 'কানে দিব কনক-কুণ্ডল' এই লোভ দেখাইতে হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়—আরও অনেক সুযোগ-সুবিধার লোভ—

আমার নগরে বৈস যত ইচ্ছা চাষ চষ
তিন সন বহি দিহ কর।
হাল প্রতি দিবে তঙ্কা কারে না করিহ শঙ্কা
পাট্টায় নিশান মোর ধর॥
নাহিক বাউড়ি দেড়ি রয়্যা বস্যা দিবে কড়ি
ডিহিদার নাহি দিব দেশে।
সেলামী বাঁশগাড়ি নানা বাবে যত কড়ি
নাহি নিব গুজরাট বাসে॥[১৪]

১৪. কালকেতু উপাখ্যান, মুকুন্দরাম, বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ।

এদিকে কলিঙ্গ রাজ্যেও আকস্মিক প্লাবনের সুযোগ পাওয়া গেল; সেই সুযোগে বন কাটিয়া বাঘ তাড়াইয়া দেখিতে দেখিতে ব্যাধের নেতৃত্বেই গুজরাট নগরের পত্তন হইয়া গেল।

চণ্ডী-মঙ্গল-বর্ণিত কালুকেতু-প্রতিষ্ঠিত এই গুজরাট নগর এবং 'শিয়রে'র কলিঙ্গ-নগর সম্বন্ধে ভয় পাইবার কোনও কারণ নাই; ইহার সহিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ গুজরাট দেশ বা কলিঙ্গ দেশের কোনও যোগ নাই; উভয় দেশই যে পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে অবস্থিত ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কারণ নাই। পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের কয়েকটি বন্য অঞ্চলকেই সাহিত্যে মহিমান্বিত করিয়া তুলিবার জন্য কবিগণ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গুজরাট, কলিঙ্গ প্রভৃতি গালভরা নাম দিয়া লইয়াছেন। দ্বিজ মাধব, মুকুন্দরাম বার বার এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন যে কলিঙ্গরাজ কংস নদীর তীরে দেবীর 'দেহারা' তুলিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গের কবি দ্বিজ রামদেব কংস নদীর ভৌগোলিক তাৎপর্য না বুঝিতে পারিয়া ইহাকে 'কংস সরোবর' করিয়াছেন। এই কংস নদীর তীরেই কলিঙ্গরাজ মহাসমারোহে দেবীর পূজা করিয়াছিলেন। সুতরাং কলিঙ্গরাজ্য কংস নদীর অঞ্চলভূমি বলিয়া মনে হয়। আবার দেখি এই কংস নদীর তীরেই দেবী পশুগণের নিকটে দর্শন দিয়া পশুগণের (বন্য অধিবাসিগণের?) পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুকুন্দরাম বলিয়াছেন 'বিজুবনে' পশুগণ দেবীর পূজা দিয়াছিল; এই বিজুবনও কংস নদীর তীরে। কালুকেতু যে গুজরাট নগর পত্তন করিলেন তাহা কলিঙ্গরাজ্য হইতে অতিশয় দুরবর্তী নহে; কারণ 'শিয়রে কলিঙ্গরাজ'। গুজরাট রাঢ়েরই একটি বন, 'বসাহ রাজ্য গুজরাট বন' (মুকুন্দরাম)। এই গুজরাটের বনের 'বড় বড় বৃক্ষ সব পেলায়ে ভাঙ্গিয়া' (মাধব) নূতন নূতন ঘর 'তোলাইয়া' যখন নগর পত্তন হইল তখন 'ইন্দিলপুর হোতে আইল প্রজা ষোল শয়ে' (মাধব); কালকেতু 'চণ্ডীপুরে দিয়া থানা কাটিয়া গহন থানা গড় করিল চারিভিতে' (মাধব)। চণ্ডী-মঙ্গলের কবিগণের বর্ণনা পড়িলেই বেশ বোঝা যায় গুজরাট হইতে কলিঙ্গদেশ বেশি দুরবর্তী নহে। আমরা দেখিতে পাই, ভাঁড়ু দত্ত যেদিন কালকেতুর দরবারে অপমানিত হইল তাহার পরের দিনই—

মিথ্যাবাক্যে রমণীরে করিয়া প্রতীত।
বাড়ীর গোধার জলে ডুব দিলেক ত্বরিত॥
দেয়ানেতে যায়ে ভাঁড়ু মনে নাঞি হেলা।
চুরি করি লইলেক ফুল কাঁচাকলা॥
ভেট সজ্জা লয়ে ভাঁড়ু করি পরিপাটি।
বাড়ীর বার্ত্তা শাক তুলি বান্দিলেক আঁটি॥
বীরের খাসি লইয়া ভাঁড়ু দেয়ানেতে যায়ে।
তারকপুর সিঙ্গাপুর ত্বরায়ে এড়ায়ে॥
বিনোদপুর এড়াইয়া যায় চণ্ডীর হাট।
উপনীত হইল গিয়া যথা রাজপাট॥

ভেট সজ্জা থুইয়া ভাঁড়ু যায়ে একু ভাগে।
দণ্ড প্রণাম কৈল ভুপতির আগে॥ (দ্বিজ মাধব)

সকালবেলা পুকুর-জলে ডুবটি দিয়া কাঁচকলা-শাক প্রভৃতির ভেট লইয়া কালকেতুর দরবারে যাই বলিয়া ভাঁড়ু দত্ত একেবারে কলিঙ্গরাজার দরবারে গিয়া উপস্থিত হইল; এই কলিঙ্গরাজ্যেরও দূরবর্তী কোনও বিরাট রাজ্য হইবার কথা নহে; আর কাঁচকলা বাথুয়া শাকের ভেট লইয়াই যে রাজার দরবারে একেবারে সোজা গিয়া ওঠা যায় সে রাজারও পরিচয় মোটামুটি আঁচ করা কষ্টকর নয়। মুকুন্দরামের বর্ণনায়ও দেখিতে পাই—

দক্ষিণে বিজয়ীপুর বামে গোলাহাট।
সম্মুখে মদনপুর সওয়াকোশ বাট॥
রাজার সভায় গিয়া হৈল উপনীত।
প্রণাম করিয়া ভেট রাখে চারিভিত॥

ভাঁড়ু দত্ত যখন কলিঙ্গরাজকে গিয়া কালকেতুর খবর সব পৌঁছাইয়াছিল তখন সে বলিয়াছে—

দিন গোঁয়াও মিছা কার্যে মন নাহি দেহ রাজ্যে
চোর খণ্ড না কর বিচার॥
কাননে বধিয়া পশু উপায় করিত বসু
ফুল্লরা বেচিত মাংস হাটে।
কোটাল ভ্রমিয়া দেশ দেখুক বীরের বেশ
কালকেতু রাজা গুজরাটে॥ (মুকুন্দরাম)

ইহা পড়িলে মনে হয়, কালকেতু কলিঙ্গরাজেরই প্রজা; কলিঙ্গরাজেরই অধিকারভুক্ত বনে সে নীচ ব্যাধজাতিভুক্ত ছিল। সেই বন-প্রদেশে 'রাতারাতি বড়লোক' হইয়া সে যে কখন নিজেই আবার রীতিমত ভূম্যধিকারী হইয়া বসিয়াছে কলিঙ্গরাজ তাহা কিছুই টের পান নাই। সহসা টের পাইবার কথাও নহে—সমস্ত অঞ্চলটিই একটি বিরাট বন্য অঞ্চল, তাহার মধ্যে কে কখন বিত্তশালী এবং শক্তিশালী হইয়া কোন্ বনে বড় বড় গাছ কাটিয়া বাঘ মারিয়া নগর-পত্তন করে কেহ আসিয়া সংবাদ না দিলে কে তাহার সন্ধান রাখে?

আসলে বেশ বোঝা যাইতেছে, কলিঙ্গ গুজরাট সব দেশই হইল রাঢ়ভূমির কংস নদীর (বর্তমান কাঁসাই নদী) তীরবর্তী একটি প্রকাণ্ড বনাঞ্চল। এই বিরাট বনভূমিতে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন আদিম জাতির ভিতরকার বীরগণ প্রবল হইয়া উঠিয়া বন কাটিয়া নগর-পত্তন করিয়াছেন, ইহাই এই অঞ্চলের সাধারণ ইতিহাস। এই নগর-পত্তন ব্যাপারে বর্ণহিন্দু-গণের প্রতিনিধিস্থানীয় সামন্তরাজগণ এবং আদিবাসিগণের প্রতিনিধিস্থানীয় বীরগণের মধ্যে সংঘর্ষ বহুবার দেখা দিয়াছে; সেই সংঘর্ষ ও মিলনের ভিতর দিয়াই ঐ অঞ্চলের মিশ্র সমাজ-জীবন, রাষ্ট্র-জীবন ও ধর্ম-জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। কলিঙ্গরাজ যে তৎকালীন

বর্ণহিন্দুর প্রতিনিধিস্থানীয় একজন ক্ষুদ্র সামন্তরাজ তাহার পরিচয় তাঁহার রাজ-সভার বর্ণনার ভিতরেই আছে। কালকেতুকে ধরিয়া আনিতে কলিঙ্গরাজ লোক-লস্কর পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; 'দিবা অবশেষে কোটাল প্রবেশে কলিঙ্গ।' তখন—

বার দিয়া বসিয়াছে কলিঙ্গ-ভূপাল।
রাজার দক্ষিণে বৈসে বিজয় ঘোষাল॥
বামদিকে মহাপাত্র নরসিংহ দাস।
সম্মুখে পাঠক চন্দ পড়ে ইতিহাস॥
রাজার সভাতে বৈসে সুপণ্ডিত ঘটা।
পরিধান পীত-বাস ভাল-জুড়ি ফোঁটা॥ (মুকুন্দরাম)

ইহার ভিতর কোটাল বন্দী কালকেতুকে উপস্থিত করিলে কলিঙ্গরাজ বলিয়াছিলেন—

ছুঁয়ো না যুয়ায় বেটা অতি নীচ জাতি।
সভামাঝে বসিয়া কথার দেখ ভাতি॥
কোন্ সাধুজনে বধি নিলি বেটা ধন।
মোরে না কহিয়া বেটা কাটাইলি বন॥ (মুকুন্দরাম)

ভাঁড়ু দত্তও আসিয়া কলিঙ্গরাজের নিকটে যখন কালকেতুর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাইয়াছিল তখনও কলিঙ্গরাজের জাত্যভিমান উদ্রিক্ত করিবার চেষ্টা দেখি—

নিবেদহুঁ নরনাথ কর অবধান।
রাজ্যেত বণিক হইল ব্যাধ বলবান॥
গোপতে সৃজিল পুরী গুজরাট নগরে।
ব্যধ-নন্দন হইয়া ছত্র ধরে শিরে॥ (মাধব)

এই বর্ণহিন্দু কলিঙ্গ ভূপতি-প্রতিষ্ঠিত বা পূজিত এক দেবীর কংসাই-অঞ্চলে প্রসিদ্ধি ছিল, এবং কংস নদীর তীরে দেবীর একটি প্রসিদ্ধ মন্দির ছিল বলিয়া মনে করি। বর্ণহিন্দু-পূজিতা বলিয়া দেবী পৌরাণিক চণ্ডিকা বলিয়াই প্রসিদ্ধা ছিলেন। কালকেতু যে বন্য ব্যাধ জাতির প্রতিনিধি তাহাদের মধ্যেও তাহাদের নিজেদের এক দেবী ছিলেন; কালকেতুর সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি লাভের সঙ্গে এই দেবীও স্বাভাবিক ভাবেই কতকটা প্রচার লাভ করিলেন। কালকেতুর গুজরাট-নগরে যে সকল বর্ণহিন্দু বসতি স্থাপিত করিল তাহাদিগকে এই বন্যব্যাধ-পূজিতা বা বনের অধিবাসী 'পশু'গণ কর্তৃক পূজিতা দেবীকেই দেবী বলিয়া গ্রহণ করিতে হইল। পশুগণ-পূজিতা এবং কালকেতুর বরদাত্রী এই দেবী কে? সবগুলি চণ্ডী-মঙ্গলেই দেখিতে পাই, এই দেবী স্বর্ণ-গোধিকা রূপ ধারণ করিয়া বনে ব্যাধ কালকেতুর নিকটে ধরা দিয়াছিলেন। ব্যাধ কালকেতু মৃগয়ার শিকার রূপেই স্বর্ণ-গোধিকাকে গৃহে লইয়া আসিল; কালকেতুর অসাক্ষাতে কালকেতুর গৃহেই স্বর্ণ-গোধিকা অপরূপ দেবীমূর্তি ধারণ করিলেন। মোটামুটি তাহা হইলে দেখিতে পাইতেছি, এই দেবীর যোগ গোধিকার সহিত। ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। পুরাণগুলির মধ্যে অত্যন্ত অর্বাচীন

পুরাণ, বৃহদ্ধর্ম-পুরাণে গোধিকারূপে দেবীর কালকেতু ব্যাধকে ছলনা করিবার উল্লেখ দেখা যায়। এই শ্লোকে ধনপতি সদাগর কর্তৃক কমলে কামিনী দর্শনের উপাখ্যানেরও আভাস পাই।[১৫] কিন্তু এই শ্লোক হইতে যে বাঙলা কাব্যে কালকেতু ব্যাধ বা ধনপতি সদাগরের কাহিনীর উদ্ভব নয়, বরং বাঙলা কাব্যের গল্পাংশ হইতেই শ্লোকটির উৎপত্তির সম্ভাবনা এ-বিষয়ে আজ আর কোনও মতদ্বৈধ নাই। পুরাণ-তন্ত্রাদি শাস্ত্রে দেবীর সহিত গোধিকার সম্পর্কের কথা অন্যভাবে দেখিতে পাওয়া যায় কালিকা-পুরাণে ও বিশ্বসার-তন্ত্রে। "কালিকা-পুরাণে চণ্ডিকার প্রীতির জন্য গোধা বলিদান করার উপদেশ পাওয়া যায়। বিশ্বসার-তন্ত্রের পঞ্চম পটলেও বলা হইয়াছে যে, গোধা-মাংসে গুহ্যকালী তুষ্টা হন।"[১৬] উক্তিগুলি কিঞ্চিৎ বিরোধী হইলেও ইহার ভিতর দিয়া মোটামুটি ভাবে দেবীর সহিত গোধার একটা যোগ দেখিতে পাইতেছি। এই গোধার সহিত দেবীর যোগের স্পষ্ট প্রমাণ মিলিতেছে বাঙলা দেশে প্রাপ্ত কতকগুলি প্রস্তরমূর্তির মধ্যে। সাধারণতঃ এই মূর্তিগুলির নিম্নদেশে একটি গোধামূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মূর্তিগুলি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের কাছাকাছির বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। মালদহে প্রাপ্ত এই জাতীয় একটি মূর্তি প্রাচীনতর বলিয়া পণ্ডিতগণের অভিমত। প্রস্তরমূর্তির মধ্যে যেমন এই গোধা-সমন্বিত দেবীর সাক্ষাৎ পাই, তেমনই সংস্কৃতে লিখিত কিছু কিছু প্রতিমা-নির্মাণ-গ্রন্থে এই গোধা-সমন্বিত দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। জৈন মূর্তি-শিল্পেও গোধা-বাহনা গৌরীমূর্তি পাওয়া যায়। সেই দেবীর ধ্যান এইরূপ—"গৌরীং দেবীং গোধাবাহনাং চতুর্ভুজাং বরদ-মুষল-যুত-দক্ষিণকরাং অক্ষমালাকুবলয়ালঙ্কৃত-বামহস্তাম্।"[১৭]

গোপীনাথ রাও তাঁহার *Elements of Hindu Iconography* গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রাচীন মূর্তিশিল্প-সম্বন্ধে গ্রন্থ 'রূপ-মণ্ডন' হইতে যে 'প্রতিমা-লক্ষণ' উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়[১৮]—

গোধাসনা ভবেদ্‌গৌরী লীলয়া হংসবাহনা।

প্রতিমা-লক্ষণে আরও দেখা যায়,—

অক্ষসূত্রং তথা পদ্মম্ অভয়ং চ বরং তথা।
গোধাসনাশ্রিতা মূর্তি গৃহে পূজ্যা শ্রিয়ে সদা॥

---

১৫. ত্বং কালকেতু-বরদা চ্ছলগোধিকাসি
যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা।
শ্রীশালবাহননৃপাদ্ বণিজঃ স্বসূনোঃ
রক্ষেঽম্বুজে করিচয়ং গ্রসতী বমন্তী (?)॥

১৬. 'মঙ্গলচণ্ডীর গীতে' শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য কর্তৃক লিখিত ভূমিকা, পৃ. ২৸৵০।

১৭. B. C. Bhattacharya, *Jaina Iconography*, পৃ. ১৭২ : শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য কর্তৃক পূর্বোক্ত ভূমিকায় উদ্ধৃত।

১৮. শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', পৃ. ৩৫২।

এই গোধাসনা বা গোধা-বাহনা অথবা অন্যভাবে গোধা-যুক্তা দেবীর প্রসঙ্গে শ্রীযুত সুধীভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয় একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য তথ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। "মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি আদিম জাতি এখনও গোধাকে কুলকেতুরূপে (totem) পূজা করিয়া থাকে।"[১২] এইখানেই সব জিনিসটির মূল সত্যের আভাস পাওয়া যায় বলিয়া মনে করি। যে সকল আদিম জাতিগণের মধ্যে গোধা ছিল কুলকেতু তাহাদের মধ্যে প্রচলিত দেবীই ক্রমে ক্রমে নানা ভাবে গোধাযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার পরে আর্য-অনার্য সব দেবীই যখন এক দেবী হইয়া উঠিতে লাগিলেন তখন গোধা-কুলকেতু-জাতিগুলির দেবীই গোধাসনা গৌরীরূপে সংস্কৃত প্রতিমা-লক্ষণে স্থান পাইলেন।

ব্যাধ কালকেতু এই গোধা-কুলকেতু জাতি-ভুক্ত বলিয়া মনে করি। যিনি এই জাতির মধ্যে আরাধ্যা দেবী ছিলেন, তিনি স্বাভাবিক ভাবেই গোধাশ্রিতা, সেই গোধাশ্রিতা দেবীই কবি-কল্পনায় রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছেন বনমধ্যে স্বর্ণ-গোধিকা মূর্তিতে। কালকেতু বনমধ্যে আকস্মিক ভাবে ধনপ্রাপ্ত হইয়া থাকিতে পারে, সে তাহার কায়িক পরিশ্রমেও অপ্রত্যাশিত ধনৈশ্বর্য লাভ করিয়া থাকিতে পারে। যে রূপেই হোক, অপ্রত্যাশিত ধনৈশ্বর্য-প্রতিপত্তি লাভ ঘটিলে তাহা যে কোনও দেবীর অনুগ্রহেই ঘটিয়াছে, এই বিশ্বাস আমাদের সমাজেব মধ্যে বর্তমান কালেও প্রচুর ভাবেই দেখিতে পাই। সে-সব ক্ষেত্রে নূতন করিয়া আনুষ্ঠানিক ভাবে কোনও দেবীর প্রতিষ্ঠা ও অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে তাঁহার পূজা-প্রচারের ইতিহাস বর্তমান কালেও দেখিতে পাইতেছি। কালকেতুর ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছিল।

এদিকে শিয়রেই রহিয়াছেন কলিঙ্গরাজ-প্রতিষ্ঠিত কংসনদীর তীরবর্তী 'দেহরা'য় বর্ণহিন্দুগণ-স্বীকৃতা এবং পূজিতা চণ্ডিকাদেবী; কলিঙ্গরাজ প্রতিষ্ঠিত সেই প্রসিদ্ধা দেবী এবং নীচ ব্যাধকুলজাত গোধা-কুলকেতু-সমন্বিত কালকেতুর আরাধ্যা গোধাশ্রিতা দেবী যে একই দেবী, সমাজে সেই যুগে এই সত্যটি বিশেষ ভাবে প্রচারিত এবং স্বীকৃত হইবার প্রয়োজন ছিল। সেই স্বীকৃতির ইতিহাসই দেখি চণ্ডী-মঙ্গলের কালকেতু-উপাখ্যানে। সমাজ-জীবনে কালকেতু ব্যাধ অর্থবলে ও প্রতিপত্তিতে এমন ভাবে মাথা নাড়া দিয়া উঠিল যে তখন তাহাকে স্বীকৃতি দিয়া বিরাট সমাজ-দেহের মধ্যে তাহার স্থান করিয়া দেওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না; তাহাকে যখন সমাজ-দেহের অচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া স্বীকার করিতে হইল তখন তৎপূজিতা দেবীকেও সমাজে প্রচলিত মহাদেবীর সহিত অভিন্না বলিয়া গ্রহণ করিতে হইল। গোধা-কুলকেতুর আদিম-জাতিগণ কর্তৃক পূজিতা গোধাশ্রিতা দেবী এইভাবে রাঢ়ের একটি বিশেষ অঞ্চলের সমাজে ও ধর্মে এক সময়ে ব্যাপক স্বীকৃতি ও প্রচার লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সিংহবাহনা দেবীর সর্ব অঞ্চলে এবং সর্ব সমাজে এত প্রসিদ্ধি ছিল যে এই গোধা-উপাদান দেবীর ক্ষেত্রে আর তেমন কোনও প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। তাই দেখি, চণ্ডী-মঙ্গলে দেবীর বনমধ্যে এই গোধিকা-রূপধারণের এবং কালকেতুর গৃহে আসিয়া

১২ প্রাগুক্ত ভূমিকা।

আবার অপরূপ দেবীমূর্তি ধারণ করিবার কাহিনীটুকু মাত্রই দেখিতে পাইতেছি ; আর বনের পশুগণের সহিতও দেবীর একটা উল্লেখযোগ্য যোগ দেখিতেছি ; অন্যত্র দেবী আমাদের সেই প্রসিদ্ধা হরজায়া পার্বতী-চণ্ডিকা। পরবর্তী কালে আমাদের সাহিত্যে এবং শিল্পে এই গোধা-সংশ্লিষ্টা দেবীর আর কোনও উল্লেখ দেখিতে না পাইলেও বাঙলা কবিওয়ালাগণের গানে দেবীর এই ব্যাধসুত কালকেতুকে অনুগ্রহ করিবার কাহিনীর উল্লেখ দেখিতে পাই—যেমন দেখিতে পাই শ্রীমন্ত সদাগরকে মশানে দেখা দিয়া অনুগ্রহ করিবার কাহিনী।[২০]

চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যগুলির ভিতরে ধনপতি সদাগরের কাহিনীর মধ্যে দেবীর আর একটি রূপের উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহা হইল দেবীর 'কমলে কামিনী' রূপ। ধনপতি সদাগর এবং তৎপুত্র শ্রীমন্ত সদাগর এই উভয়েই সিংহল গমনের পথে সমুদ্রমধ্যে 'কালীদহে' দেবীর এই 'কমলে কামিনী' মূর্তি দর্শন করিয়াছে। সঙ্গের নাবিকগণ কেহই এই 'কমলে কামিনী' দেখিতে পায় নাই, সিংহলের রাজা আসিয়াও প্রথমে দেখিতে পায় নাই। দ্বিজ মাধবের বর্ণনায় দেখি—

কমলেতে কমলিনী বসি রামা একাকিনী
গজরাজ ধরে বাম করে।
ক্ষনেকে উঠাইয়া পেলে ক্ষণে ধরে অবহেলে
ক্ষণেকে আননে নিয়া ভরে ॥

মুকুন্দরামের বর্ণনায়ও দেখি—

অপরূপ দেখ আর ওহে ভাই কর্ণধার
কামিনী কমলে অবতার।
ধরি রামা বাম করে সংহারয়ে করিবরে
উগারিয়া করয়ে সংহার ॥

দ্বিজ রামদেব বর্ণনাকে আরও একটু বিস্তারিত করিয়াছেন—

---

২০. কালু বীরকে ধন দিয়ে তুমি,
আবার গিয়েছিলে তার ঘরে।—লালু-নন্দলাল। প্রাচীন কবিওয়ালার গীত
ডাকি দুর্গা দুর্গা বোলে,
ধোরেছিল ব্যাধের ছেলে
কালকেতু তোমায়।—নীলমণি পাটুনী। ঐ
তম গুণে সাধনসিদ্ধি, সত্য জানা গেল ;
জানি তম গুণে তরে গেল,
কালকেতু ব্যাধের ছেলে ॥—কানাই। ঐ
একবার মুখে দুর্গা ব'লে কালকেতু তোর চরণ পেলে।—রসিকচন্দ্র রায়,
শাক্ত-পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কমল কোরকদলে কামিনী বসিয়া হেলে
গজরাজে সংহারে পদ্মিনী।
কি যে দেখি অপরূপ বিদরে আম্কার বুক
যেন দেখি হিমালয়-নন্দিনী॥
কমলে কমলমুখী কমল যুগল আঁখি
কমলিনী কমলতরঙ্গে।
পাকাইয়া করিবরে গর্জে রামা হুহুঙ্কারে
পেখি মন পড়ে মন ভঙ্গে॥
খেনে করিরাজ ধরি খেনে পাছারিয়া মারি
খেনে খেনে গগনে উতারি।
ও কী বিস্তারিয়া অতি ও কী ধরে মুখ পাতি
ও কী কি কমলে-কুমারী॥

এই 'কমলে কামিনী'র উপাখ্যান পরবর্তীকালে বেশ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাকে অবলম্বন করিয়া যাত্রা-পাঁচালী গড়িয়া উঠিয়াছিল। 'এই যে ছিল কোথা গেল কমল-দলবাসিনী' গানটি কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও গ্রাম্য গায়কগণের মুখে খুব শোনা যাইত। মধুসূদন 'কমলে কামিনী' লইয়া সনেট লিখিয়াছেন। পরবর্তী কালের অনেক কবিও এই কাহিনীর কাব্যময় ব্যাখ্যা দিয়া কবিতা রচনা করিয়াছেন।

চণ্ডী-মঙ্গল-বর্ণিত এই কমলে কামিনী উপাখ্যান গজ-লক্ষ্মীর কিংবদন্তী অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই গজ-লক্ষ্মীর মূর্তি অতি প্রাচীন; কিন্তু পূর্ব ভারতে ইহার কোনও যুগেই তেমন কোনও প্রসিদ্ধি দেখিতে পাই না; ইহার প্রসিদ্ধি দক্ষিণ ভারতে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে। বাণিজ্যসূত্রে ভারতের দক্ষিণ উপকূলে গিয়া বাঙালীগণ এই গজ লক্ষ্মীর সহিত পরিচিত হইয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাহারই কাব্যময় রূপ চণ্ডী-মঙ্গলের এই 'কমলে কামিনী।'

দক্ষিণ ভারতে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে গজ-লক্ষ্মীর যে-মূর্তি খুব প্রচলিত তাহা হইল এই—সমুদ্রের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড পদ্ম ফুটিয়াছে, তাহার উপরে দণ্ডায়মান এই লক্ষ্মীদেবী; দুই পাশ হইতে দুইটি হস্তী দুইটি হেমকুম্ভ শুঁড়ে জড়াইয়া দেবীর মস্তকে সলিল-সিঞ্চন করিতেছে। কোথাও শুধু শুঁড়ের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত সলিল সিঞ্চন করিতেছে। এই গজ-লক্ষ্মীর মূল পরিকল্পনাটিও পৌরাণিক কবি-কল্পনা হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়। বৈদিক খিলসূক্ত শ্রী-সূক্তের[২১] ভিতরেই আমরা লক্ষ্য করিতে পারি শ্রী-দেবী (বা লক্ষ্মী দেবী) নানা ভাবে পদ্মের সহিত সংশ্লিষ্টা। পুরাণগুলিতেও আমরা শ্রী বা লক্ষ্মী দেবীর সহিত পদ্মের এই সংস্রব বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে পারি। এই শ্রী বা লক্ষ্মী সৃষ্টিরূপিণী;

২১. ঋগ্‌বেদের ৫ম মণ্ডলের অন্তে খিলসূক্তস্থ পঞ্চদশটি মন্ত্র।

সর্বদেশেই পদ্ম সৃজনী-শক্তির প্রতীক রূপে গৃহীত। এই জন্যই বিষ্ণুর নাভি-কমলে প্রজাপতি ব্রহ্মার অবস্থানের কল্পনা। এই জন্যে লক্ষ্মী বৈদিক বর্ণনা হইতেই পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত পদ্মা, পদ্মাসনা, পদ্মালয়া, কমলা, কমলাসনা, কমলালয়া। এই কমল সলিলোদ্ভূত; সেই জন্যই কি লক্ষ্মীর সমুদ্রোদ্ভব কল্পনা করা হইয়াছে? আমরা বৈদিক শ্রী-সূক্তেই লক্ষ্য করিতে পারি, লক্ষ্মী পদ্মা, পদ্মবর্ণা পদ্মোত্থিতা, আবার 'আর্দ্রা'। বিষ্ণু-পুরাণে সমুদ্র মন্থনের ফলে এই শ্রী-দেবীর আবির্ভাবের বর্ণনায় দেখি—

ততঃ স্ফুরৎকান্তিমতী বিকাসিকমলে স্থিতা।
শ্রীর্দেবী পয়সস্তস্মাদুত্থিতা ধৃতপঙ্কজা॥
... ...
গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তোয়ৈঃ স্নানার্থমুপতস্থিরে।
দিগ্ গজা হেমপাত্রস্থমাদায় বিমলং জলম্।
স্নাপয়াঞ্চক্রিরে দেবীং সর্বলোকমহেশ্বরীম্॥[২২]

'তখন বিকশিত কমলে স্থিতা পদ্মমালাধারিণী স্ফুরৎকান্তিমতী শ্রীদেবী সেই জল (সমুদ্রবারি) হইতে উত্থিতা হইলেন।...তখন গঙ্গাদি নদীসমূহ বিবিধ জলের দ্বারা দেবীর স্নানের জন্য উপস্থিত হইলেন। দিগ্ গজগণও হেমপাত্রস্থ বিমল জল লইয়া সেই সর্বলোকমহেশ্বরী দেবীকে স্নান করাইয়াছিল।'

আমাদের মনে হয়, এই জাতীয় কবিত্বময় বর্ণনা হইতেই গজ-লক্ষ্মীর পরিকল্পনা গড়িয়া উঠিয়াছে। এই গজলক্ষ্মী পরিকল্পনার বিস্তারেই দেখিতে পাই, কমলস্থিতা দেবী দুই হাতে করী লুফিয়া খেলিতেছেন; একবার তাহাকে গ্রাস করিতেছেন, আবার তাহাকে মুখ হইতে উদ্গীর্ণ করিয়া দিতেছেন (গ্রসতী বমন্তী)। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে পারি শ্রী-সূক্তে দেবীকে 'পুষ্করিণীং' বলা হইয়াছে।[২৩] 'পুষ্কর' শব্দ গজশুণ্ডাগ্রবাচক। আর একটি পৌরাণিক তথ্যের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পুরাণে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বিষ্ণু-মায়ার প্রসঙ্গে স্থানে স্থানে বলা হইয়াছে যে, এই দেবী সদেবাসুর-মানুষ সর্ব জগৎকে গ্রাস করেন, আবার সৃজন করেন। কূর্ম-পুরাণে দেখি—

অনয়ৈব জগৎ সর্বং সদেবাসুর মানুষম্।
মোহয়ামি দ্বিজশ্রেষ্ঠা গ্রসামি বিসৃজামি চ॥[২৪]

ইহাই কি দেবীর গজ-ভক্ষণ এবং গজ-বমনের তাৎপর্য? বৃহদাকার হস্তী কি এখানে বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরই প্রতীক মাত্র? পরবর্তী কালের কবীর প্রভৃতির প্রহেলিকা-কবিতার ভিতরেও এই ভাবের আভাস দেখিতে পাই।

---

২২. প্রথমাংশ, ৯ম অধ্যায়।
২৩. আর্দ্রাং পুষ্করিণীং পুষ্টিং ইত্যাদি।
২৪. পূর্বভাগ, ১।৩৫, বঙ্গবাসী সং।

বাঙলা মঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্যে আসিয়া দেবীর যত প্রকারের রূপান্তর দেখিতে পাই তাহার ভিতরে একটি বিশেষ লক্ষণীয় রূপান্তর হইল দেবীর লৌকিক রূপান্তর। পৌরাণিক তত্ত্ব, উপাখ্যান, বর্ণনা, কিংবদন্তী সামাজিক উত্তরাধিকার রূপেই মঙ্গলকাব্যের কবিগণ অনেকখানি পাইয়াছেন। কাহারও কাহারও হয়ত পুরাণাদির সহিত কিছু কিছু প্রত্যক্ষ যোগও থাকিতে পারে। উমার হিমালয়-দুহিতা রূপে জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মহেশ্বর শিবের সহিত তাঁহার বিবাহের আখ্যান মঙ্গল-কাব্যের কবিগণ মোটামুটি ভাবে কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের অনুরূপ ভাবেই বর্ণনা করিয়াছে। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এই সব উপাদান অতি স্বাভাবিক ভাবেই মঙ্গলকাব্যকারগণের রচনায় স্থান পাইয়াছে—এই সব উপাদান লইয়া আর পৃথক্ ভাবে বিস্তারিত আলোচনার তেমন কোনও প্রয়োজন দেখিতেছি না। লক্ষণীয় নূতন উপাদান হইল সেই সেই যুগের মানবীয় উপাদান। মঙ্গল-কাব্যগুলিতে দেখিতে পাই, কৈলাসবাসী যোগেশ্বর শিব ক্রমে ক্রমে বঙ্গবাসী 'মাতাল ভোলা'য় রূপান্তরিত হইয়াছেন; দেবীও সঙ্গে সঙ্গে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের বেকার মাতাল বৃদ্ধ স্বামীর সুখদুঃখের ভাগিনী বঙ্গবাসিনী দারিদ্র্য-লাঞ্ছিতা 'ঘরণী'। হর গৌরীর এই লৌকিক রূপান্তরের আভাস বিভিন্ন যুগের সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যেই রহিয়াছে; কিন্তু সেখানেও দেবীর স্বামি-পুত্র-কন্যা লইয়া ঘর-সংসার লৌকিক গৃহচিত্রকে অবলম্বন করিয়া চিত্রিত হইলেও সেখানে দেবী এমনভাবে 'দিন-আনে দিন খায়'-পর্যায়ের নিম্নমধ্যবিত্ত সংসারের সুখদুঃখজালে জড়াইয়া পড়েন নাই। সংস্কৃত বর্ণনাগুলির ভিতরে মনে হয় সাময়িকভাবে দেবী লৌকিক জালে বদ্ধ হইয়া পড়িলেও তাঁহার কৈলাস গমনের সম্ভাবনা একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই; কিন্তু বাঙালী কবিগণ স্থানে স্থানে দেবীকে এমনভাবে বাঙলাদেশের ভাঁড়ার-উঠান-রান্নাঘরের মধ্যে জড়াইয়া ফেলিয়াছেন যে, সেখান হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পুনঃ কৈলাস প্রবেশের বুঝি আর কোনও পথ নাই।

মুকুন্দরামের চণ্ডী-মঙ্গলে পৌরাণিক বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকেই দেবীর এই মানবীয় রূপান্তর আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। 'বাপের ঘরে' যাইবার অনুমতি চাহিয়া সতীরূপে দেবী শিবের নিকট যে বিনতি জানাইয়াছেন তাহার ভিতরেই বাপের-বাড়ি-মুখী বাঙালী মেয়ের রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেবী শিবকে বলিতেছেন—

সুমঙ্গল সূত্র করে আইনু তোমার ঘরে
পূর্ণ বৎসর হইল সাত।
দূর কর অপরাধ পূরহ মনের সাধ
মায়ের রন্ধনে খাব ভাত॥
পর্ব্বত কন্দরে বসি নাহি পাট পড়সী
সীমন্তে সিন্দুর দিতে সখী।
একদিন কোথা যাই যুড়াইতে নাহি ঠাঁই
বিধি মোরে কৈল জন্ম দুঃখী॥[২৫]

২৫. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ।

কয়েক বৎসর একাদিক্রমে স্বামীর ঘর করিয়া সেই করুণ আকুতি—'মায়ের রন্ধনে খাব ভাত!' যাগ-যজ্ঞ উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য ঐ মায়ের হাতের রান্নাটুকু। আবার মায়ে-ঝিয়ে যেখানে কলহ লাগিয়াছে সেখানেও একেবারে বাঙালী ঘরের চিত্র। সতী দেহ ত্যাগ করিয়া উমারূপে গিরিরাণী মেনকার ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বৃদ্ধ শিবের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। হর-গৌরীর বিবাহে বাঙালী স্ত্রী-আচার মেনকা কিছুই বাকি রাখেন নাই;[২৬] প্রতিবেশিনীগণকে লইয়া 'জলসহা'র অনুষ্ঠানও বিধিমত পালন করিয়াছেন। কিন্তু বিবাহের পরে বৃদ্ধ জামাতা বাবাজীর আর শ্বশুর-গৃহ হইতে নড়িবার চড়িবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। নড়িয়া-চড়িয়া লাভই বা কি, নড়িলে-চড়িলেই ত আবার ছেঁড়া ঝুলি লইয়া ভিক্ষায় বাহির হইতে হইবে। পার্বতীও বাপের বাড়ি মহা আনন্দেই আছেন, দিন-রাত্রি পাশা খেলিয়াই চলিয়া যায়। কিন্তু গরীব মা-বাপ আর কত দিন পারে? তা ছাড়া জামাই বাবাজী ত আর ঠিক একা নহে, সঙ্গে ত আবার কিছু ভূত-প্রেত তাল-বেতালও রহিয়াছে। তদুপরি জামাইয়ের আবার একটু নেশার অভ্যাস আছে, ভাঙের খরচটাও শ্বশুর-শাশুড়ীর উপর দিয়াই চলে। মেয়েও শুধু যে বাপ-মায়ের ঘাড় জুড়িয়াই আছে তাহা নহে, দিনরাত বসিয়া পাশাই খেলিবে, ঘরে একা বৃদ্ধা মা পারে না দেখিয়াও তৃণগাছি ছিঁড়িয়া ভিন্ন করিবে না। সংসার যখন প্রায় অচল হইয়া উঠিল এবং শরীরও যখন আর চলে না তখন মা মেনকাকে কন্যার প্রতি কিছু কর্কশবাণী প্রয়োগ করিতেই হইল—

তোমা ঝিয়ে হৈতে গৌরী মজিল গিরিয়াল।
ঘরে জামাই রাখিয়া পুষিব কত কাল॥
দুগ্ধ উথলিতে গৌরী নাহি দেহ পানি।
সখী সঙ্গে খেল পাশা দিবসরজনী॥
দরিদ্র তোমার পতি পরে বাঘছাল॥
সবে ধন বুড়া বৃষ গলে হাড়মাল॥
প্রেত ভূত পিশাচ মিলিল তার সঙ্গ।
অনুদিন কত নাকি কিনা দিব ভাঙ্গ॥
রান্ধি বাড়ি আমার কাঁকাল্যে হইল বাত।
ঘরে জামাই রাখিয়া জোগাব কত ভাত॥ —মুকুন্দরাম

কিন্তু মেয়েও বেশ কোমর বাঁধিয়া ঝগড়া করিবার মেয়ে, ছাড়িয়া কথা বলিবার পাত্রী নহেন; তিনি নিজের অংশের জমা-জমি ভাগ-বাঁটরাও বেশ বোঝেন।—

এমন শুনিয়া গৌরী মায়ের বচন।
ক্রোধে কম্পমান তনু বলেন তখন॥

২৬. রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের 'শিবায়নে' হর-গৌরীর 'শয্যা তোলনী'রও চমৎকার বর্ণনা দেখিতে পাই।

জামাতারে পিতা মোর দিল ভূমি দান।
তাহে ফলে মাষ মুগ তিল সর্ষা ধান॥
রান্ধিয়া বাড়িয়া মাতা কত দেহ খোঁটা।
আজি হইতে তোমার দুয়ারে দিমু কাঁটা॥

এই বলিয়া গৌরী কোপে ও অভিমানে 'ঝলকে ঝলকে লোচনের লোহ' বহাইয়া দিয়া বৃদ্ধ স্বামী লইয়া মায়ের ঘর ছাড়িয়া চলিলেন। ইহার পরে মাতাল বেকার অলস বৃদ্ধ স্বামী লইয়া দেবীর দুঃখ-দারিদ্র্যের ঘর-করনা—সে সব চিত্র একেবারেই আমাদের দৈনন্দিন 'কষ্টের সংসারে'র চিত্র।

পূর্বের দিন শিব ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন, বৃদ্ধ বয়সে রোজ রোজ আর বাহির হইতে ইচ্ছা করে না; এদিকে সেদিনকার ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল যে তৎপূর্বদিনের 'উধার শুধিতে'ই খরচ হইয়া গিয়াছে তাহা ত ভোলানাথের জানিবার কথা নহে; তিনি সকালবেলা উঠিয়াই খোশমেজাজে 'গণেশের মাতা'কে একটু ভাল-অভাল রান্নার ফরমাশ করিলেন; এই রান্নার পদ প্রকরণের তালিকাটি নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালীর পক্ষে এতই রসাল যে আমরাও তালিকাটি উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।—

আজি গণেশের মাতা রান্ধ মোর মত।
নিমে সিমে বেগুনে রান্ধিয়া দিবে তিত॥
সুকুতা শীতের কালে বড়ই মধুর।
কুমড়া বার্তাকু দিয়া রান্ধিবে প্রচুর॥
নটিয়া কাঁটাল-বিচি সার গোটা দশ।
ফুলবড়ি দিবে তাহে আর আদা-রস॥
কটু তৈল দিয়া রান্ধ সরিষার শাক।
বাথুয়া ভাজিয়া তৈলে কর দৃঢ় পাক॥
রান্ধিবে মুসুরি ডাল দিবে টাবা-জল।
খণ্ড মিশাইয়া রান্ধ করঞ্জার ফল॥
... ...
ঘৃত জিরা সম্ভলনে রান্ধিবে পালঙ্গ।
ঝাট স্নান কর গৌরী না কর বিলম্ব॥ —মুকুন্দরাম

শিব ঠাকুরের কিঞ্চিৎ নেশার মৌতাতে দেবী রান্নার ফরমাশ ত বেশ পরিপাটি ভাবেই পাইলেন; কিন্তু তিনি ত আর কৈলাসের দেবী নন, সৃষ্টিকারিণী বিশ্বজননীও নন, তিনি হইলেন বাঙলা দেশের ঘরে ঘরে যে-সব 'রমেশের মাতা', 'পরেশের মাতা', 'যোগেশের মাতা' রহিয়াছেন তাঁহাদেরই অন্যতমা 'গণেশের মাতা'। তিনি কাটাছাটা জবাব দিলেন—

রন্ধন করিতে ভাল বলিলে গোঁসাই।
প্রথমে যে দিব পাত্রে তাই ঘরে নাই॥

আজিকার মত যদি বান্ধা দেহ শূল।
তবে সে আনিতে পারি প্রভু হে তণ্ডুল॥

অতঃপর স্বামি-স্ত্রীতে গৃহ-কলহ বাঙালীর গৃহে যে রূপ ধারণ করে শ্রীশ্রীকৈলাসধামেও সেই রূপই ধারণ করিল।

দেবীর এই লৌকিক রূপের চরম দৃশ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে রামেশ্বরের 'শিবায়ন' কাব্যে। শিব ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছেন, বাড়ির নিকটে আসিয়া 'বুড়া-ভিখারী' বিষাণে ফুঁ দিলেন; 'হাভাতে ঘরে'র পেট-টিংটিং দুই ছেলে কার্তিক-গণেশ, বাপ ভিক্ষা হইতে ফিরিয়াছে বুঝিতে পারিয়াই কিঞ্চিৎ খাদ্যলোভে ছুট দিল। রোজ এই সময়ে ভিক্ষার জিনিস লইয়া এক কলহ-কোন্দলের পালা দেখা দেয়; সুতরাং—

বালকে বারণ করে বিশাল লোচনী।
কৈর নাই কোন্দল কোপিবে শূলপাণি॥
অদ্য বাছা ভব্য হও সব্য চক্ষু নাচে।
তব বাপ আল্যে দিব বাট্যা থাক কাছে॥[২৭]

কিন্তু ক্ষুধিত বালকেরা কি আর এই সব বিনয়-বচনে কর্ণপাত করে? তাহারা ধাইয়া গিয়া বাপের 'পথ আগুলিল' এবং পিতার কাঁধের ভিক্ষার ঝুলি দেখিয়া একপায়ে নাচিতে আরম্ভ করিল। তখন 'শূলী দিল ঝুলি দোঁহে লুটী কর্যা খায়।' দুই ভাই হাঁটু গাড়িয়া কাড়াকাড়ি আরম্ভ করিল; কাড়াকাড়ি হইতেই হুড়োহুড়ি, হুড়োহাড় হইতে হাতাহাতি। কার্তিকের ত মোটে দুইটি হাত, তাহাও গণেশ শুঁড় দিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছে, এবং সে নিজে চারি হাত দিয়া তাহার গজমুখে মুঠি মুঠি খাবার গিলিতেছে। তখন অতি স্বাভাবিক ভাবেই 'কাতিক কান্দেন করাঘাত কর্যা বুকে'। ইহাত প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার—তর্জন-গর্জন, মার-ধর করিয়া কিছু লাভ নাই; তাই—

দুর্গা দেখ্যা বলে ডাক্যা শুন গজানন।
কাতিকের করে কিছু দাও বাছাধন॥
বিনয় মায়ের বুঝ্যা বিনায়ক শূর।
কিছু দিল কাতিকে কোন্দল হৈল দূর॥

শিব হাজার হোক বুড়া মানুষ, ঝুলি কাঁধে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। শিবকে বসিতে আসন দিয়া গণেশের মা পাখার বাতাস করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু পাখার বাতাসে কি আর 'বুড়াশিবের' শ্রান্তি যায়?

শিব বলে শুন শিবা সেবা কর কী।
ফাক উড়ে ভাঙ্গ বিনা ভেক্কা হয়্যাছি॥
ঘরে ছিল ঘোটনা মুষল গেল ফাট্যা।
দিন দুই দানবদলনী দেহ বাট্যা॥

২৭. শ্রীযোগিলাল হালদারের সংস্করণ।

কিন্তু মায়ের পক্ষে দানব দলন করা অনেক সহজ, তাহাতে মায়ের উৎসাহও প্রচুর ; কিন্তু ঘরে বসিয়া বুড়া ভিখারী স্বামীর ভাঙ বাটিতে মায়ের বড় অনিচ্ছা।
সুতরাং—

পার্বতী বলেন আর পারি নাই যাও।
পোড়া ভাঙ গুড়া সিদ্ধ ফাঁকি কর‍্যা খাও॥

কিন্তু—

গিরিশ বলেন গৌরী গুড়া সিদ্ধি আছে।
গুড়া খায়্যা বুড়া মানুষ পড়্যা মরি পাছে॥

বলিয়া বুড়ামানুষ দেবীর নিকটে নানাভাবে অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিলেন, এবং পার্বতীকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে 'ভার্য্যার পরম ভাগ্য ভাঙ্গি যার ভর্তা' এবং স্বামীর কথার উপরে 'মুখসাট মার‍্যা' কথা বলা স্ত্রীর পক্ষে নিতান্তই অশোভন। তখন দেবী আর কি করেন?—

হরবাক্যে হৈমবতী হাসে খল খল।
গৌরী গর্গরী হস্তে গড়াইল জল॥
গাঁজা-ঝাড়া তিতা তাজা ভিজাইয়া তাকে।
মহিষমর্দিনী বাট্যা দিল মুহূর্তেকে॥
হিণ্ডীর সমীপে চণ্ডী দিল হাণ্ডী ভর‍্যা।
শিব তাকে ছাকে বাপে-পোয়ে বস্ত্র ধর‍্যা॥

সিদ্ধি খাইয়া বুড়াশিবের বেশ মৌতাত বৃদ্ধি হইল ; ঝট্‌পট্‌ ছুটি রান্না করিয়া দিবার জন্য 'গিরীশের ঝি'র প্রতি আদেশ হইল। দেবী রান্না করিলেন ; বাপে-পোয়ে তিন জনে খাইতে বসিলেন। দেবী খাবার দিতেছেন, কিন্তু পারিয়া উঠিবেন কেন? এদিকে কার্তিকের 'ষড়ানন', গণেশের এক ; সুতরাং দুই পুত্রের সাত মুখ— স্বামীর পঞ্চ মুখ— একুনে বারখানি মুখ।

তিনজনে একেবারে বারমুখে খায়।
এই দিতে এই নাই হাড়ি পানে চায়॥
... ...
সুক্তা খায়্যা ভোক্তা চায়্য হস্ত দিল শাকে।
অন্নপূর্ণা অন্ন আন রুদ্রমূর্তি ডাকে॥
কার্তিক গণেশ ডাকে অন্ন আন মা।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য হৈয়্যা খা॥

মায়ের কথা শুনিয়া কার্তিক ধৈর্য ধারণ করিয়া মৌনী হইয়াছিল— কিন্তু শিব পিছন হইতে কার্তিককে উস্কানি দিতেছিলেন এবং মায়ের বাক্যে কি জবাব দিতে হইবে তাহাও পিছন হইতে শিখাইয়া দিতেছিলেন। সুতরাং কার্তিক বলিয়া উঠিল—

রাক্ষস ঔরসে জন্ম রাক্ষসীর পেটে।
যত পাব তত খাব ধৈর্য হব বটে॥

পুত্রের উক্তি শুনিয়া মা রাগিলেন না ; হাসিয়া অন্ন বিতরণ করিতে লাগিলেন।—

দিতে নিতে গতায়াতে নাহি অবসর।
শ্রমে হৈল সজল সকল কলেবর॥
... ...
হরবধূ অম্লমধু দিতে আর বার।
খসিল কাঁচলি কুচে পয়োধর ভার॥
লাটাপাটা হাতে বাটা আলাইল কেশ।
গব্য বিতরণ কৈল দ্রব্য হইল শেষ॥

স্বামী-পুত্রের খাওয়া হইয়া গেলে মা নিজে খাইতে বসিলেন। মায়ের সেই খাইতে বসার মধ্যেও কবি রামেশ্বর বঙ্গ-পল্লী জনৈকা 'গণেশের মা'র সমবয়সীদের বা সহচরীদের লইয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া গল্পে গুজবে হাস্য-কৌতুকে আস্তে আস্তে গ্রাস তুলিবার চিত্রটি ভুলিতে পারেন নাই।

সহচরী সঙ্গে করি পসারিয়া পা।
গ্রাস গড়ে গিরিসুতা গণেশের মা॥
মধ্যখানে মহামায়া সখী সব পাশে।
অন্নমুখে উপকথা আরম্ভিয়া হাসে॥

একদিন সকালবেলা বুড়াশিব 'রামরস' একটু বেশী মাত্রায় সেবন করিয়া নেশায় বুঁদ হইয়া আছেন, আজ আর ভিক্ষায় বাহির হইবাব ইচ্ছা নাই। কিন্তু নেশায় জমিয়া একটু বসিয়া থাকিবার উপায় কি ? 'ভাত নাই ভবনে ভবানী বাণী বাণ।' নিত্যকারের সেই তিক্ত বাক্যবাণে বুড়ার মেজাজ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, বলিলেন, 'কালিকার কিছু নাই উড়াইলে সব'? এ-কথায় দেবী অপমানিতা বোধ করিলেন; তিনি বলিলেন, তিনি 'ভিক্ষুকের ভার্যা' হইলেও ছোটলোকের ঝি নন, তিনি 'ভূপতির ঝি', সুতরাং সংসারের জিনিস এদিক-ওদিক করিবার অভ্যাস তাঁহার নাই—'দিয়াছিলে যত ধন লেখ্যা-কর্যা নেও'। নিরক্ষর বুড়া ভিখারী জীবনে কোনদিন লেখা-পড়ার ধার ধারেন নাই; তিনি একটু 'রামরস' পান করেন আর হরিনাম গান করেন।—

বিশ্বনাথ বলে এই বয়সে আমার।
বসুমতী পাতাল গিয়াছে কতবার॥
লেখাজোখা জানি নাই রামরস খায়্যা।
হয়্যাছি অজরামর হরিগুণ গায়্যা॥
মোকে মিথ্যা লেখাজোখা মনে মনে কর।
ঠেক্যাছি তোমার ঠাঁঞি ঠেঙ্গাইয়া মার॥
ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী খাব নাই ভাত।
যাব নাই ভিক্ষায় যে করে জগন্নাথ॥

পার্বতী বলিলেন, 'এখন ত ভাঙ-সিদ্ধির নেশায় জমিয়া আছ— ভাতের আর দরকার নাই, নেশা ভাঙিলেই তো আবার দুটি কিছু খুঁটিয়া খাইবার দরকার হইবে। তা ছাড়া, নিজে না হয় বুড়ামানুষ একদিন খাবার না হইলেও চলিবে; বাপের কাছেই যে দুই 'পো' বসিয়া আছে, তাহারা ত একটু পরেই 'ক্ষুধা হৈলে কবে মোকে খাইতে দেনা গো'; তখন আমি কি উপায় করিব?' প্রসঙ্গতঃ মহামায়া এ-কথা অতি স্পষ্টভাবেই জানাইয়া রাখিলেন যে তাঁহার নিজের কিন্তু আর করিবার কিছুই নাই; কারণ—

ডাকিনী ডিম্বের ঘরে ডুবাইল দেশ।
ধার দিতে আর কেহ নাই অবশেষ॥
বান্ধা দিতে বাকি নাই দিতে নাই দাতা।
জঠর আনলে বলে জগতের মাতা॥

এখানে 'জগতের মাতা' শব্দের অর্থ হইল দুনিয়ার দরিদ্রের ঘরের সাধারণী-কৃত মাতা।

অতএব শেষ পর্যন্ত ছেঁড়া-ফুটা তালিমারা ঝুলিটি কাঁধে করিয়া বুড়াশিবকে আবার বাহির হইতে হয়। এদিনে কিন্তু ভিক্ষায় অনেক কিছু মিলিল; শুধু চাল-ডাল নয়, ধন-রত্নও। বাড়িতে আসিয়া 'বুড়া' যখন ঝুলিটি পার্বতীর সামনে হাসিয়া রাখিলেন তখন পার্বতী সুখী হইলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিতা এবং ভীতাও হইলেন। এত ধন যে ফোঁটাকাটা হরিনাম-করা বুড়া ভিক্ষা করিয়াই লাভ করিয়াছেন তাহা পার্বতীর বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না; তাই—

সুন্দরী সুধান শিবে সত্য বল শূলী।
কারে মার্যা ধন হর্যা পুরাইলে ঝুলি॥
গলা ভর্যা মালা যার কপাল জুড়্যা ফোঁটা।
দিনে হও ব্রহ্মচারী রাতে গলা-কাটা॥
. . . .
বৈষ্ণব বলাও বিপরীত কর কাজ।
ধর্ম নাশ আর হাস নাই বাস লাজ॥

কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যেও এইটুকু ধর্মবোধ বঙ্গ-পল্লীর 'গণেশের মা'র পক্ষে স্বাভাবিক এবং সঙ্গতই হইয়াছে।

এই ভাবেই চলে দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রামের ভিতর দিয়া অষ্টাদশ শতকের বঙ্গ-পল্লীর হর-পার্বতীর সংসার। কিন্তু এইভাবে শুধুমাত্র উঞ্ছবৃত্তিতে আর কত দিন চলে? ছেলে দুইটি বাড়িয়া উঠিতেছে, অন্যান্য পোষ্যও কিছু বাড়িয়া যাইতেছে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেবী একদিন বৃদ্ধ পতিকে বলিলেন,—'চষ ত্রিলোচন চাষ চষ ত্রিলোচন।' শিবের এই চাষ করিবার প্রসঙ্গ অবশ্য অতি প্রাচীন কাল হইতেই দেখিতে পাই। যজুর্বেদে ভগিনী অম্বিকাসহ যে রুদ্রের উল্লেখ পাই সেখানে রুদ্র ও অম্বিকা উভয়েই শস্যের সঙ্গে যুক্ত। বাঙলা 'শূন্য-পুরাণে' শিবের চাষ চষিয়া বিবিধ রকমের ধান ফলাইবার বিস্তৃত বর্ণনা

পাই। এখানে শিবকে চাষের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছে ভৃত্য ভীম। কিন্তু বিদ্যাপতি-রচিত পদে দেখি দেবীই শিবকে চাষ চষিতে বলিতেছেন। এই বর্ণনার সহিত রামেশ্বরের বর্ণনার মিল আছে।—

বেরি বেরি অরে সিব মো তোয় বোলো
কিরিষি করিঅ মন লাই।
বিনু সরমে রহহ ভিখিএ পএ মাগিঅ
গুন গৌরব দূর জাই॥
নিরধন জন বোলি সবে উপহাসএ
নহি আদর অনুকম্পা।
তোহে সিব পাওল আক ধুথুর ফুল
হরি পাওল ফুল চম্পা॥
খটগ কাটি হরে হর যে বঁধাওল
ত্রিসুল তোড়িঅ করু ফাবে।
বসহা ধুরন্ধর হর লএ জোতিঅ
পাটএ সুরসরি ধারে॥[২৮]

"বারে বারে হে শিব, তোমাকে আমি বলি, মন দিয়া কৃষি কর। বিনা লজ্জায় তুমি ভিক্ষা মাগ, গুণ-গৌরব দূরে যায়। নির্ধন বলিয়া সকলে উপহাস করে, আদর-অনুকম্পা করে না; তুমি শিব পাইলে আকন্দ ও ধুতুরা ফুল, (আর) হরি পাইল চাঁপা ফুল। হে হর, খট্টাঙ্গ কাটিয়া হল বাঁধাও, ত্রিশূল ভাঙ্গিয়া কর ফাল; ধুরন্ধর বৃষভকে হল লইয়া জুড়িয়া দাও—সুরেশ্বরীর (গঙ্গার) ধারায় পাট কর।"

যাহা হোক, রামেশ্বরের শিবায়নে দেখি, এক দিন নয়, দুদিন নয়—এখন দেবী নিত্যই সময় সুযোগ মত 'নরমে গরমে' এই চাষের পরামর্শ দিতেছেন, নতুবা আর যে উপায় নাই। শিবও কথাটা ভাবিয়া দেখিলেন, কিন্তু ঠিক মন সরে না; দরিদ্র হইলেও দেবতার জাতি (ব্রাহ্মণ?)—চাষ করাটা কি শোভন হইবে? দেবীকে শিব বলিলেন—

বলি বিলক্ষণ কিছু শুন শৈলসুতা।
দেবতার পোত-বৃত্তি বড়ই লঘুতা॥
ভিক্ষে দুঃখে আছি ভাল অকিঞ্চন পণে।
চাষ চষ্যা বিস্তর উদ্বেগ পাব মনে॥

তাহা ছাড়া 'শুনিতে সুন্দর চাষ শুনিতে সুন্দর'; কিন্তু কাজে তত সহজ নহে। কারণ

চাষ বলে ওরে চাষী তোরে আগে খাব।
মোরে খাবে পশ্চাতে যদ্যপি ক্ষেতে হব॥

ভাল চাষ করিলেই ভাল ফসল ফলিবে এমন কথা নাই, 'শুখা হাজা'র ভয় আছে। তাহার

২৮. বিদ্যাপতি, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ও শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত।

পরে 'গরীবের ভাগ্যে যদি শস্য হয় তাজা' তখন আবার 'রাজা' (ভূম্যধিকারী) আছেন রাজার সঙ্গে আবার তাঁহার 'কায়েত'ও আছেন। সুতরাং দেবীর নিকটে শিবঠাকুর অন্য কোনও ব্যবসায়ের বুদ্ধি চাহিলেন। দেবী বলিলেন, আর ব্যবসা আছে বাণিজ্য, তাহাতে দুইটি জিনিস না হইলেই নয়—একটি 'পুঁজি' (পুঞ্জি), অপরটি প্রবঞ্চনা-বুদ্ধি; ইহার একটিও শিবঠাকুরের নাই, তাই বাণিজ্য তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বিতীয় ব্যবসায় আছে 'রাজসেবা', 'সেব্য' জাতির পক্ষে তাহাও অসম্মানের; সুতরাং চাষই শিবের পক্ষে একমাত্র সম্ভাব্য বৃত্তি। শিব বলিলেন, চাষের জন্য অনেক কিছু যে চাই, তাহার যোগাড় হইবে কিরূপে? দেবী বলিলেন—

দেখ বিনা বেতনে বিশাইয়ে বল্যা কালি।
গাছ কাট্যা গড়াইব লাঙ্গলের ফালি॥
ঘাত কর‍্যে তারে লয়্যা পাতাইবে শাল।
শূল ভাঙ্গ্যা সাজসজ্জা গড়াইব কাল॥

এই 'বিশাই' মূলে 'বিশ্বকর্মা' বটেন, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে ইনি বাঙলাদেশের 'গণেশের মা'র প্রতিবেশী 'বিশাই কামার'—যাহাকে বলিয়া কহিয়া সম্প্রতি বিনা মজুরীতেই হাল গড়াইয়া লওয়া যাইবে বলিয়া গণেশের মায়ের বিশ্বাস। এতক্ষণ গৃহিণীর (ব্রাহ্মণীর) উপদেশ-পরামর্শ শিবঠাকুর মন দিয়াই শুনিতেছিলেন; কিন্তু 'শূলভঙ্গ শুনিয়া শিবের হৈল কোপ।' কিন্তু কোপ করিলে কি হইবে, শেষ পর্যন্ত সেই প্রস্তাবেই রাজি হইতে হইল। শিবঠাকুর তাঁহার বাহন বৃষটি লইয়া এবং শূলপাণির শূলের দ্বারা তৈরী লাঙ্গল লইয়া হরিনাম করিতে করিতে চাষে চলিলেন—

চলিল চঞ্চল বৃষ চণ্ডী রন চায়্যা।
হরষেতে যান হর হরিগুণ গায়্যা॥

জমি কিছু পাওয়া গিয়াছে কোচ্-পাড়ায়—নিজেদের গ্রাম হইতে তাহা অনেকদূর। শিব সেই কোচ্-পাড়ায়ই চলিলেন চাষ চষিতে। শিব যখব বাড়ি ছাড়িয়া কিছুদিনের জন্য চলিলেন, তখন—

ত্রিপুরা বলেন তবে আস গিয়া প্রভু।
ছাল্যা দুটীর তত্ত্ব লইও কভু কভু॥
শিব বলে সম্প্রতি সে কথা রাখ হাতে।
আকাশ ভাঙ্গিল শুন্যা অম্বিকার মাথে॥

শঙ্কর চাষের জন্য চলিয়াছেন দেবীচকের (রামেশ্বরের মেদিনীপুরে কৃষি-অঞ্চল এখনও বিভিন্ন 'চক' নামেই পরিচিত) দিকে, কারণ এইখানেই 'হরিহর' শিবের সংসার চলিয়া যায় এমন কিছু চাষ-জমি দেবোত্তর লিখিয়া দিয়াছেন। বাড়িতে থাকিতে হইবে অন্নহীন গৃহে দুইটি নাবালক পুত্র লইয়া একা গৌরীকে। শিবঠাকুর বৃদ্ধ হইলেও গৌরী যে এখনও অল্পবয়স্কা কুলবধূ; শিবের অনুপস্থিতিতে ভিক্ষায় বাহির হওয়াও তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়।

শিব বলিয়া গেলেন, 'ধরাধর-সুতা ধান্য ধার কর তুমি'; কিন্তু 'পার্বতী বলেন প্রভু পারি নাই আমি'; কারণ কর্জের অনেক লেঠা; 'মন্দ যায় গোঠে মাঠে মায়্যা থাকে ঘরে। ভাঁড়াবার দায় নাই নিত্য দায় ধরে॥' পাওনাদার যখন তখন আসিয়া হানা দেয়, দায় সামলাইতে হয় মেয়েদের; তাহারা বাহিরে আসিয়া কথাও বলিতে পারে না, ঘরের কোণে লুকাইয়া থাকিয়া ছেলের মুখে পাওনাদারের সঙ্গে কথা বলিতে হয়। তাহা ছাড়া—

কুবেরের কাছে পূর্বে লেঠা আছে মোর।
কতবার ক্রোধিয়া বল্যাছে ঋণচোর॥

এই 'কুবের'কেও সোজা ধন-দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই, ইনি গ্রাম্য লগ্নি-কারবারী—হয়ত 'বিশাই কামারে'র কাছাকাছি বাড়ি। মোটামুটি গৌরীর একা একা বাড়ি থাকিবার কোনও দিক হইতেই ইচ্ছা নাই; তিনি স্পষ্ট বলিয়া বসিলেন—

ভাল যদি চাও মোরে লয়্যা যাও সাথে।
বাপ-নেওট ছাল্যা আমি নারিব পত্যাতে॥
ছটফট্যা ছাল্যা সব ছাড়্যা গেল্যা ঘর।
দশ হাতে ধুমধাম দিবে অতঃপর॥

কিন্তু কোনও কথায়ই কিছু ফল হইল না; দেবীকে একা ঘরে রাখিয়া শিব তাঁহার অনুচর ভীমকে লইয়া দেবীচকে চাষের জন্য চলিয়া গেলেন।

বুড়া শিব ও অনুচর ভীমের পরিশ্রমে ও যত্নে দেবীচকে ফসল ভালই ফলিয়াছে; শিব জমি ছাড়িয়া আর বাড়িতে আসিলেন না। এ দিকে দেবী একা বাড়িতে আর কতদিন থাকিবেন, নানা ফন্দি-ফিকির করিয়া শিবকে বাড়ি আনিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনও চেষ্টাই সফল হইল না। শেষে দেবী বাগ্দিনীরূপ ধারণ করিয়া শিবের ফলন্ত শস্যের ক্ষেত্রে গিয়া মাছ ধরিতে আরম্ভ করিলেন। শিব বাগ্দিনীর ভোলে পড়িলেন, ইহা লইয়া হর-পার্বতীর কিঞ্চিৎ আদিরসাত্মক লীলা দেখিতে পাই। যাহা হউক শেষ পর্যন্ত শিব বাড়ি ফিরিলেন; শিব-শিবানীর মিলন হইল।

শিব এবারে দেবীচকের চাষী শিব, ক্ষেতে ভাল ফসল ফলিয়াছে; শিবানীর বহুদিন পরে মনে একটা শখ জাগিয়াছে; তিনি স্বামি-সোহাগের উপরে নির্ভর করিয়া আব্দার জানাইলেন—

দুঃখিনীর হাতে শঙ্খ দেহ দুটী বাই।
কৃপা কর কান্ত আর কিছু চাই নাই॥
লজ্জায় লোকের কাছে দাণ্ডাইয়া রই।
হাত নাড়া দিয়া বাড়া কথা নাহি কই॥
তুল ভাটি পারা দুটি হস্ত দেখ মোর।
শঙ্খ দিলে প্রভুর পুণ্যের নাহি ওর॥

কিন্তু বুড়া স্বামী শিব বড় রূঢ়ভাষী ; প্রত্যাখানের মধ্যে আর কোনও সহানুভূতি নাই—

শঙ্খের সংবাদ বলি শুন শৈলসুতা।
অভাগার ঘরে এক অসম্ভব কথা॥
গৃহস্থ গরীব তার সাত গাঁঠ্যা তেনা।
সোহাগী মাগীর কানে কাটা কড়ি সোণা॥
ভাত নাই ভবনে ভর্তার ভাগ্য বাঁকা।
মূল খাট্যা মরে তারে মাগী মাগে শাঁখা॥

প্রত্যাখানের এই ভাষা ও ভঙ্গি বঙ্গীয় বৃদ্ধ চাষীর উপযুক্ত বটে। কিন্তু পার্বতীর মনে রূঢ় আঘাত লাগিল—অপমানে অভিমানে দেবী রক্তবর্ণা হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বাঙালীর ঘরের বধূ, রাগ করিয়া আর কোথায় যাইবেন ? শেষ পর্যন্ত সেই বাপের বাড়ি! পার্বতীও সেই বাপের বাড়িই চলিলেন। শেষে অবশ্য শিব নিজেই শাঁখারি সাজিয়া গৌরীর বাপের বাড়ি গিয়া গৌরীকে শাঁখা পরাইয়া আসিয়াছিলেন।

এই কাহিনীটির উপরে আরও লৌকিক রস ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছেন কবিওয়ালা রামজী দাস। সংসারের দুঃখ-দারিদ্র্য আক্ষোভ-বিক্ষোভের আলোচনা ভাল জমে মামায়-ভাগিনায় বসিয়া। ভাগিনা নারদ গিয়াছেন মামা শিবের বাড়ি ; শিব ভাগিনাকে একান্তে নিরালায় পাইয়া মনের ক্ষোভে বলিতেছেন—

আমার হলো একি দায়, তোর চাষা মামী শাখা চায়।
বুঝে না অবোধ নেকী ধরে দুটা পায়॥
কাতিক গজানন, ছেলেরা দু'জন,
ক্ষুধাতে আকুল হ'য়ে কান্দে সর্বক্ষণ,
ভাত না পেলে বাবা বলে দিগম্বরকে খাবলে খায়॥
তোর চাষা মামী সদা মোরে বলে কুবচন,
সে মানে নাক সদাই বলে ভাঙ্গড় ত্রিলোচন,
... ...
আমি কাঙ্গাল ত্রিলোচন, কোথা পাব ধন,
কি দিয়ে কিনে শাঁখা দিব রে এখন,
(আমার) সম্ভাবনা ছেঁড়া তেনা বাঘের ছালা পরি গায়॥[২৯]

আমরা রামেশ্বরের শিবায়ন হইতে দেবীর লৌকিক রূপান্তরের চিত্র একটু বিস্তৃত ভাবেই উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম। রামেশ্বর অবশ্য তাঁহার কবি-কল্পনায় দেবীর লৌকিক রূপের মধ্যে কিঞ্চিৎ স্থূলতারও আমদানী করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র 'আয়্যগণ'কে দিয়া হর-পার্বতীর বর শয্যা এবং শয্যাতোলনী উপলক্ষ্যে আদিরসাত্মক স্থূল রসিকতাও বাদ দেন নাই। তাঁহার 'শিবায়নে' আরও দেখি, কুমারী অবস্থায় নির্জন কুঞ্জে গিয়া শিবের আরাধনার

২৯. প্রাচীন কবিওয়ালার গান, শ্রীপ্রফুল্লকুমার পাল সম্পাদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

জন্য দেব-সমাজে পার্বতীর চরিত্র সম্বন্ধে কানাকানিও দেখা দিয়াছিল এবং সেই অপবাদ স্থালনের জন্য মধ্যযুগের অন্যান্য বাঙলা-কাব্যের নায়িকাগণের মত পার্বতীকেও বলিতে দেখি,—

কালি মোর দিহ বিভা আজি কর জ্ঞাতিসভা
বহ্নিশুদ্ধা হইব সংপ্রতি ॥

কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করিতে হইবে, দেবীকে আমাদের সুখ দুঃখ অভাব-অভিযোগ-ভরা দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনের সহিত যতটা সম্ভব যুক্ত করিয়া দেখিবার চেষ্টা আমরা এই যুগে আরও অনেক স্থলে লক্ষ্য করিতে পারি। দেবীকে ব্যবহারিক জীবনের সহিত যতটা সম্ভব জড়াইয়া লইবার চেষ্টা হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছে অনেক কিংবদন্তী ও উপাখ্যান। মা যে কন্যারূপে 'রামপ্রসাদের বাঁধলে বেড়া' এই কিংবদন্তীর পশ্চাতেও এই মনোভাবেরই অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। আমরা রামেশ্বর আর রামকৃষ্ণের শিবায়নে দেবীর শাঁখা পরিবার উপাখ্যান দেখিতে পাই। এই উপাখ্যান টুকরা টুকরা হইয়া চৈত্র-মাসের গাজন গানের মধ্যে দেখা যায়। পূর্ববঙ্গের চৈত্রসংক্রান্তির নীল-পূজা উপলক্ষেও এই উপাখ্যান আমরা গীত হইতে শুনিয়াছি। সর্বশ্রেণীর বাঙালী নারীর আদরের বস্তু শাঁখা-সিন্দূর; যিনি বাঙালীর দেবী হইবেন তিনিও অবশ্যই শাঁখা-সিঁদুর-প্রিয়া হইবেন। এই মনোভাব হইতেই ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যার শাঁখারির নিকট হইতে শাঁখা-পরিবার স্নিগ্ধ মধুর উপাখ্যানটি গড়িয়া উঠিয়াছে। কবি তরুদত্ত উপাখ্যানটিকে অবলম্বন করিয়া ইংরেজিতে একটি চমৎকার কবিতা রচনা করিয়াছেন, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক তাহার বাঙলা অনুবাদটিও স্বাদ্য। উপাখ্যানটি সংক্ষেপে এই—তখনও ঠিক প্রভাত কাটিয়া বেলা হয় নাই; সোনার আলোমাখা গ্রাম্য পথ ধরিয়া হাঁকিয়া যাইতেছিল একটি শাঁখারি—'শাঁখা চাই, চাই শাঁখা'। কাছে 'ধানসেরা' দীঘির ঘাট; ঘাটে স্নানের জন্য চলিয়াছিল অপূর্বা সুন্দরী একটি রমণী; শাঁখারির 'শাঁখা চাই' ডাকের সাড়া দিল সেই রমণী। শাঁখারি তাঁহার কোমল সুগঠিত দুই হাতে পরাইয়া দিল মনোমত দুইগাছি শাঁখা। রমণী শাঁখা পরিয়া অদূরের একটি মন্দির দেখাইয়া বলিল, সেইখানে তাহার বাড়ি, শাঁখারি যেন সেখানে গিয়া তাহার পিতার নিকট হইতে শাঁখার দাম গ্রহণ করে; একটি ঝাঁপির মধ্যেই ঠিক দাম পাওয়া যাইবে। শাঁখারি মন্দিরের পূজারীর নিকট এই কথা বলিলে বিস্মিত পূজারী শাঁখারিকে লইয়া ঘাটে আসিয়া কন্যা-রূপিণী দেবীকে দেখা দিতে বলিলেন; স্তব্ধ নিথর কালো জলের মধ্য হইতে শুধু দেবীর শাঁখা-পরা হাত দুখানি জাগিয়া উঠিয়া আবার মিলাইয়া গেল!

ইহা বিশেষ কোনও কবির কবি-কল্পনা মাত্র নহে, ইহা বাঙলা-দেশের সহজ বিশ্বাসেরই একটি সহজ প্রকাশ।

এই যে দেবীর লৌকিক রূপান্তরের কথা বলিলাম, ইহার ভিতরে দুইটি দিক লক্ষ্য করিতে পারি। একদিকে দেখিতে পাই, দেবীর সকল লীলা বর্ণনার ভিতর দিয়া মানবীয়

রূপ গুণের প্রকাশ; এই মানবীয় রূপগুণ দেবীর মহিমাকে সম্পূর্ণ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে এমন কথা বলিতে পারি না; মানবতার আধারে দেবীর মহিমা আরও যেন স্নিগ্ধ কমনীয় হইয়া উঠিয়াছে—আরও আমাদের আপনার হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতকের অনেকগুলি শাক্ত পদের মধ্যে দেবত্ব ও মানবত্বের এই সানন্দগ্রাহ্য মিলন আমরা লক্ষ্য করিতে পারিব। কিন্তু দেবীর এই মানবীয়তা লাভের আর একটি স্থূল রূপ আছে যেখানে দেবী শুধু উপলক্ষ্য বা অবলম্বন-মাত্র, সেখানে আমাদের যুগচিহ্নিত সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনের স্থূলরূপের চিত্রটিই অঙ্কিত হইয়াছে। 'শিবায়ন' গুলির মধ্যে দেবীর মানবীয় রূপান্তর অনেক স্থলে এই-জাতীয় স্থূলতা লাভ করিয়াছে। এই-জাতীয় স্থূলত্বের চরম নিদর্শন দেখিতে পাই দাশরথি রায়ের পাঁচালীর কিছু কিছু বর্ণনায়। চন্দ্রের সাতাইশ পত্নী (ইহারা সকলেই দক্ষকন্যা) যখন দক্ষালয়ে যজ্ঞ-উপলক্ষ্যে চলিয়াছেন; তখন দক্ষালয়ে যাইবার পথে তাঁহারা বড় ভগ্নী সতীর সহিত দেখা করিলে সতী দুঃখ করিয়া বলিলেন—

অশ্বিনী দিদি, আমারে দুঃখিনী দেখিয়া পিতে।
অবজ্ঞা করিয়ে যজ্ঞে আজ্ঞা না করিলেন যেতে॥

তখন কন্যাগণের মধ্যে গরিব কন্যার প্রতি ধনী পিতার অবজ্ঞার কথাটি দেবীকে মানবীয় রূপান্তর দান করিলেও একান্ত স্থূল করিয়া তোলে না। কিন্তু তাহার পরে যখন দেখিতে পাই শিব সতীকে পিত্রালয়ে যাইতে নিষেধ করিয়া তাঁহার (শিবের) সঙ্গে ও শ্বশুর মহাশয় দক্ষের সঙ্গে সম্পর্কের প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

আমাদের ভাব যেমন জামাই আর শ্বশুরে।
যেমন দেবতা আর অসুরে॥
... ...
যেমন জল আর আগুনে।
যেমন তৈল আর বেগুনে॥
যেমন পক্ষী আর সাতনলা।
যেমন আদা আর কাঁচকলা॥
যেমন ঋষি আর জপে।
যেমন নেউল আর সাপে॥
যেমন ব্যাঘ্র আর নরে।
যেমন গৃহস্থ আর চোরে॥
যেমন কাক আর পেচকে।
যেমন ভীম আর কীচকে॥
যেমন শরীর আর রোগে।
যেমন দিন কতক হইয়াছিল ইংরাজ আর মগে

এই মত অসদ্ভাব দক্ষে আমায়।
শুন প্রিয়া আর কিছু কহিব তোমায়॥[২৯]

আরও কিছু কহিবার আর প্রয়োজন করে না; দাশু রায় এই পর্যন্ত শিবের মুখে যাহা বলাইয়াছেন তাহাই যে কোনও মর্ত্যবাসীর নিকটেও কানে হাত দিবার পক্ষে যথেষ্ট। দাশরথি রায়ের এই জাতীয় বর্ণনা আরও উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করিবার অন্য কোনও প্রয়োজন নাই, কিন্তু লৌকিক রূপান্তরে দেবীকে কতদূর পর্যন্ত নামিতে হইয়াছে তাহারই আরও একটু নমুনা দিবার জন্য আরও কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। গিরিরাণী মেনকা সন্তান প্রসব করিলেন; ধাত্রী প্রসূতিকে কন্যা জন্মের কথা শুনাইল। শুনিয়া বাক্যশেলাহতা গিরিরাণী খানিকক্ষণ মুখ ফিরাইয়া নীরব রহিলেন এবং পরে সরবে কান্না জুড়িয়া বলিতে লাগিলেন—

সুসন্তান শুনে গিরি কর্তো কত বাবুগিরি
কিছু সাধ ঘটলো না রে ঘটে।
সকল আশায় দিয়ে কালী কোথাকার এ পোড়াকপালী
মর্তে এসেছিলি মোর পেটে॥
না করে কোলে অম্বিকায় পড়ে রন মা মৃত্তিকায়
নারীগণ শুনিল পরস্পরে।
সকলে হৈয়ে একযোগ গিয়ে কচ্ছে অনুযোগ
মন্দিরের দ্বারের বাহিরে॥
মেয়ে বলে কি অনাদরে ফেলেছিস্ ধরা উদরে
তুই তো মায়ের মেয়ে বটিস্ কিনা।
চমকে মরি চমৎকার মর মাগির কি অহঙ্কার
দেখি নাই তো করে এত কারখানা।[৩০]

মুখের উপর এইরূপ কড়া কথা শুনাইয়া দিবার আড়শী-পড়শীগণ উপস্থিত না থাকিলে গরিব বাঙালী মায়ের কৃষ্ণ-বর্ণা বালিকা রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া পার্বতীর যে কি অবস্থা হইত তাহা কল্পনা করা যাইতেছে না। পিতা গিরিরাজ কিন্তু মাতার মতন নহেন; তিনি কন্যার জন্মোৎসবেই প্রচুর দান-ধ্যান করিলেন। দৈবাৎ এক ব্রাহ্মণের ভাগ্যে কিছু কমতি পড়িল। তখন—

অসন্তুষ্ট হয়ে মন ব্রাহ্মণ করেন গমন
আর এক বিপ্র সহ দেখা পথে।
দানের দুঃখের কথা মানের অতি খর্বতা
তার কাছে কহে খেদমতে॥

---

২৯. অথ দক্ষযজ্ঞ।
৩০. অথ শিববিবাহ।

বলিব কি হে ভট্টাচার্য দেশের বিচার কিমাশ্চর্য
ভার্যার কথায় রাজ্য এলেম হেঁটে।
পরিশ্রম হলো পণ্ড পাষাণ বেটা কি পাষণ্ড
দুঃখে মোর বক্ষ যায় ফেটে॥
ঠুঁটোর মত মুঠো করে দুটী মুদ্রা দিলেন মোরে
ভাবলাম দুটো কথা বলে যাই।
ছিল দুই দুরন্ত দ্বারি দ্বারে দু'টো স্কন্ধে হাত দে ধরে
দুটো দুয়ারের বার করেছে ভাই॥[৩১]

ইহার পরে পার্বতীর অন্নপ্রাশনের পালা। পর্বত-পুরবাসিনিগণের সঙ্গে একত্র হইয়া গিরিরাণী মেনকা নিজেই সব রান্না করিয়াছেন, সকলে খাইয়াও সুখী; কিন্তু সেদিনও নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এক বিশ্বনিন্দুক ছিলেন॥—

বিশ্বনিন্দুক একজন গিরিপুরে করি ভোজন
বিরাশি সিক্কার ওজন মতে।
এক মোট বস্ত্রে বান্ধিয়ে ভৃত্যের মস্তকে দিয়ে
ব্যস্ত হয়ে গমন হয় পথে॥
তারে দেখি যত্ন করে একজন জিজ্ঞাসা করে
ভোজনের কেমন পারিপাট্য।
শুনলেম ভোজনের ভারি যশ দ্রব্য নাকি নানা রস
বস্ত্র নাকি দান কচ্ছেন পট্ট॥
বিশ্বনিন্দুক হেসে কয় তুমিও যেমন মহাশয়
তারি কর্মে তারিপ ও মোর দশা।
সংসারটা ভারি আঁটা মহাপ্রেত সে গিরিবেটা
মিনসে হতে মাগি দ্বিগুণ কসা॥

মা পার্বতীর অন্ন-প্রাশনে আসিয়াই থামিয়া গেলাম, বিবাহাদির ঘোঁট-জোলসে আর প্রবেশ না-ই করিলাম।

---

৩১. অথ শিব বিবাহ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বাংলা পুথি

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বাংলা দেশের যে সকল প্রতিষ্ঠানে প্রাচীন পুথি সংগ্রহ ও আলোচনা করিবার ব্যবস্থা আছে তাহাদের মধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। বাংলা পুথির বৈজ্ঞানিক আলোচনায় ইহা অগ্রণী। ইহার পত্রিকা ও গ্রন্থাবলীর মধ্যে পরিষদ্ বা অপরের সংগৃহীত বহু পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহারই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অন্যান্য পত্রিকায়ও মাঝে মাঝে প্রাচীন পুথি সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।[১] পরিষৎপ্রকাশিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণের প্রথম খণ্ড প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ মহাশয়ের সংকলিত ছয় শত পুথির বিবরণ এবং দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম সংখ্যায় শিবরতন মিত্র সংকলিত বীরভূম 'রতন লাইব্রেরী'তে সংগৃহীত ২০১ খানি পুথির বিবরণ স্থান লাভ করে। ১৩৩০ হইতে ১৩৩৯ সাল পর্যন্ত নয় বৎসরে এই বিবরণের তৃতীয় খণ্ডের তিন সংখ্যায় পরিষৎপুথিশালায় সংগৃহীত পুথির বিবরণ প্রকাশিত হয়। ইহাদের মধ্যে পরিষৎ-পুথিশালার অন্তর্ভুক্ত প্রথম চারিশত পুথির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহার মধ্যে রামায়ণের পুথিই বেশি। ইহা ছাড়া, কিছু মহাভারত, মঙ্গল কাব্য ও বৈষ্ণব পুথি আছে। তৃতীয় সংখ্যায় বর্ণিত একশত পুথির অধিকাংশই বৈষ্ণব গ্রন্থের। এই সংখ্যার ভূমিকায় গ্রন্থগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচিত হইয়াছে।

এইভাবে পরিষদের পুথির বিবরণ সংকলিত হইতে থাকিলে সমগ্র পুথি সংগ্রহের বিবরণ প্রকাশিত হইতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হইবে। তাহা ছাড়া, পুথি সংগ্রহের ক্রমিক সংখ্যানুসারে পুথির বিবরণ লিপিবদ্ধ হইলে একই গ্রন্থের একাধিক পুথির বা একই বিষয়ের বিভিন্ন গ্রন্থের পুথির বিবরণ খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হয়। ইহা মনে করিয়া প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে পুথি সংগ্রহের বিষয়ানুক্রমিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংকলনের কাজে হাত দিই। ১৩৩৫ সালে পরিষৎসংগৃহীত সংস্কৃত পুথির বিবরণ প্রকাশিত হয়—১৩৫১ সালে বাংলা পুথির বিবরণের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়।[২] উহাতে রামায়ণের ৪২৬ খানি,

---

১. আবদুল করিম—গোকুল মঙ্গল (সাহিত্য, ১৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা), কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত—প্রাচীন পুথির বিবরণ (ভারতবর্ষ, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা), অক্রূরচন্দ্র সেন—পূর্ববঙ্গের প্রাচীন বাংলা সাহিত্য (ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন ২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা), কবি জনার্দন (এডুকেশন গেজেট, ১৩১৭-৩১ ভাদ্র)।

২. দীর্ঘকাল পরে ক্রমিক সংখ্যানুসারে পরিষদের বাংলা পুথির বিবরণ সংকলনের কাজ পুনরায় আরম্ভ করা হয়। পরিষৎ পত্রিকার ৬১-৬৪ খণ্ডে ৩২৩ (৪০১-৭২৩) খানি পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি ইহা তৃতীয় খণ্ড চতুর্থ সংখ্যা রূপে স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

মহাভারতের ৮৩৬ খানি ও ভাগবতের ২৯১ খানি বা মোট ১৫৫৩ খানি পুথির বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। চিত্তরঞ্জন-সংগ্রহ সহ ১৩৪২ সাল পর্যন্ত সংগৃহীত পুথির প্রায় অর্ধাংশের বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। বাকী অর্ধাংশ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা দেওয়াই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।[৩] ভাগবতের উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত 'বিবরণে' অন্তর্ভুক্ত হয় নাই এমন আরও প্রায় একশত পুথি আছে। কবিচন্দ্রের রাধিকামঙ্গলের তিনখানি পুথি 'বিবরণে' উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও দুইখানি পুথি পরিষৎ-সংগ্রহে আছে। ইহাদের একখানি (২৪৪ চি) ১০৭২ সালের লেখা। কৃষ্ণদাসের নারদ-সংবাদের প্রায় কুড়িখানি পুথির মধ্যে একখানি (২৭৭ চি) ১০২৮ সালে লেখা। ইহার বর্ণনীয় বিষয় এইরূপ—দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া নারদ কর্তৃক কৃষ্ণের নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও কৃষ্ণের উত্তর দান। কলিধর্ম, দশাবতার বর্ণন, সৃষ্টিবর্ণন ও ভক্তির প্রাধান্য খ্যাপন ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। যদুনাথ দাসের ভ্রমরগীতা বা ভ্রমর সংবাদ (২৯১ ৪, ৩৮চি, ৪২২ চি) ও কোকিল সংবাদ (৩৬০ চি) নামক ক্ষুদ্র পুস্তক দুইখানির প্রথমখানিতে ভ্রমরকে দূত কল্পনা করিয়া কৃষ্ণের নিকট যাইবার অনুরোধ ও তদুপলক্ষে গোপীগণের আক্ষেপোক্তি বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খানির বর্ণনীয় বিষয়—বিরহে ব্যাকুল কৃষ্ণ কর্তৃক এক কোকিলকে শ্রীমতীর নিকট প্রেরণ, শ্রীমতীর কৃষ্ণ সকাশে গমনে অনিচ্ছা জ্ঞাপন, কৃষ্ণ কর্তৃক কোকিলকে পুনঃ প্রেরণ ও পরিশেষে রাধাকৃষ্ণের মিলন। দ্বিজ ভগীরথের তুলসীচরিত্রে (২৪৩ চি) নারায়ণ কর্তৃক বৃন্দার সতীত্ব হরণ, শঙ্খাসুরবধ, বৃন্দার শাপে নারায়ণের শিলাত্বপ্রাপ্তি ও নারায়ণের শাপে বৃন্দার তুলসীরূপে জন্ম—এই উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। কৈলাস বসুর মহাভাগবত পুরাণে (৭৯৯-৮০১) শিবের বিবাহ, তারকাসুর বধ, রাবণ বধ, প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। রামায়ণের পুথির মধ্যে উল্লিখিত অদ্ভুত রামায়ণও (৫৬৬) ইঁহার রচনা। রামপ্রসাদ রায়ের কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু (১৩৪৯) ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অবলম্বনে রচিত। এই প্রসঙ্গে জীবন চক্রবর্তীর কৃষ্ণমঙ্গল—নৌকাখণ্ড (৩৫৭ চি), নরহরি দাসের কেশবমঙ্গল (২৩০১), বিপ্র পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল (২২৯ চি), দ্বিজমাধবের কৃষ্ণমঙ্গল (২২৮ চি), সীতারাম দাসের উষাহরণ পালা ও বাণযুদ্ধ পালার (১৩৬ চি, ১৩৭ চি) পুথি উল্লেখযোগ্য।

পাঁচালি মঙ্গলকাব্য প্রভৃতির পুথি সংখ্যা প্রায় তিনশত। পাঁচালি জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে সত্যনারায়ণ, সত্যপীর বা সত্যদেবের পাঁচালির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবি বল্লভ, কালীচরণ, কৃষ্ণধন, কৌতুকরাম চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গারাম দত্ত, পণ্ডিত গুণনিধি, জৈমিনি, নিধিরাম, ফকিররাম (চাঁদ ?), কবিভূষণ, বল্লভদাস, কবি বিদ্যাপতি, কবি বেচারাম, মথুরেশ, দ্বিজ রামকৃষ্ণ, রামভদ্র, রামেশ্বর, শঙ্কর আচার্য, শিবরাম বাজ, শ্যামদাস দত্ত প্রভৃতি কবির নাম যুক্ত ও কবির নাম শূন্য প্রায় চল্লিশখানি পুথি এই বিভাগে আছে।

৩. পরিষদের বাংলা পুথির সাধারণ পরিচয় আমি ইতিপূর্বে পরিষৎ পত্রিকার ৩৯শ ও ৪৮শ খণ্ডে দুইটি প্রবন্ধে এবং পরিষদের বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণের তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় সংখ্যার ভূমিকায় প্রদান করিয়াছি।

ইহাদের মধ্যে ফকিররামের নামযুক্ত রামায়ণের একাংশের একখানি পুথি 'বিবরণে' উল্লিখিত হইয়াছে। কবিরাজ ফকিররাম কবিভূষণের শশিসেনা (৮৮৫) গ্রন্থের একখানি পুথিও পরিষদে আছে। সত্যনারায়ণের উপাখ্যানের বৈচিত্র্য বিশেষ আলোচনার যোগ্য।

কালিদাস, পরশুরাম, দ্বিজ বিনোদ, দ্বিজ যদুনাথের শনির পাঁচালির পাঁচখানি পুথি, সাগর বসু ও দ্বিজ শ্রীধরের একাদশীর পাঞ্চালী বা একাদশীর মাহাত্ম্যের তিনখানি পুথি, দ্বিজ কালিদাসের সূর্যব্রত পাঁচালি বা সূর্যের ব্রতকথার দুইখানি পুথি, দ্বিজ বৈষ্ণব (দাস) রচিত বাবা হর পাঁচালি, দ্বিজ রামকান্তের জন্মাষ্টমীর ব্রতকথা, দ্বিজ রামপ্রসাদের সুবচনীর ব্রতকথা, বাণীরাম ঠাকুরের নিয়ত মঙ্গল চণ্ডীর পাঁচালির দুইখানি পুথি, দ্বিজ রঘুনাথের নিকট মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালির দুইখানি পুথি, দ্বিজ গদাধরের জয়মঙ্গল-চণ্ডীর ব্রতকথা ও গ্রন্থকারের নামহীন ঘোর মঙ্গলচণ্ডীর পুথি পরিষদে আছে। বাংলার লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানের ইতিহাসে এগুলির বিশেষ মূল্য আছে।

লক্ষ্মীচরিত্রের চৌদ্দখানি পুথির মধ্যে একখানিতে (২৪১৯) কমলাকান্ত, দুইখানিতে (২১৩৪, ২৩২৭) দয়ারাম দাস, দুইখানিতে (৫৩৯, ১৪০৬) ভরত পণ্ডিত এবং পাঁচ খানিতে (১৭৭, ১ চি, ১৪০৪, ১৪০৫, ২৫২৫) গুণরাজখানের নাম পাওয়া যায়। দয়ারাম দাসের আর একখানি গ্রন্থ ধুনা কুটার পালা (২৩৪৯) সরস্বতীর মাহাত্ম্য বর্ণনাত্মক কাব্য। জগন্নাথ বন্দনার পুথিতে (৮৪৫, ১৩৫২, ২৩৮৮) গ্রন্থকারের নাম দ্বিজ দয়ারাম—একখানিতে (৮৪৪) দ্বিজ দয়ারাম দাস। দয়ারাম দ্বিজের 'সই সাঙ্গাতীর কথা' (৯২০) ব্যঙ্গাত্মক রচনা মনে হয়। গুণরাজখানের সংক্ষিপ্ত রামায়ণ 'বিবরণে' উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার নাম-যুক্ত শ্রীধর্মইতিহাস বা কথা ইতিহাসে (২১৭৮) মহাভারতের কাহিনী বর্ণিত আছে। এই গুণরাজখান ও মালাধর বসু অভিন্ন কিনা বলিবার উপায় নাই। সীতারাম দাসের জিবিত বাহন বা জীমূতবাহনের বন্দনার পুথির একটিমাত্র পাতা পাওয়া গিয়াছে (২৪৪৪)—ইহাতে জীমূতবাহনের পূজার কথা আছে। বিষয়টি মূল্যবান্—এজন্য উদ্ধৃত হইল।

করপুটে নতিমান্ বন্দ দেব জিবিতবা [হ]ন
রবিসুত তুমি মহাশয়।
তোমারে পূজয়ে যে সমরে বিজয়ী সে
আপদ বালাই দূর হয়॥
কাকবন্ধ্যাশ্রিত যারা পুত্র কন্যা হয়্যা হারা
তোমার অর্চনা যেবা করে।
ভাদ্রমাসে সিত পক্ষ দেবতা গন্ধর্ব রক্ষ
নাগনর সংসার ভিতরে॥
অষ্টমীতে পূজার পদ্ধতি।
বটপত্রে বেল্য ধান ইক্ষুদণ্ডে অধিষ্ঠান
চতুর্দিগে বেষ্টিত যুবতি॥

আয়্যস্থয়া গণ মেলি সবে দেয় হুলাহুলি
বাদ্য ভাণ্ড বাজে নানারূপ।
নানা পুষ্প মাল্য চুয়া তাম্বূল কস্তুরি গুয়া
চন্দন অগৌর ধুনা ধূপ॥
গিরিসি যাহার মাতা দিবাকর যার পিতা
আপনে বিজয়ী তিন লোক।
তোমার চরণে মন সদা বাঞ্ছে যেই জন
নাঞি জানে ধনপুত্র শোক॥
জগত বিখ্যাত নাম প্রতাপেতে অনুপাম
ত্রিভুবনে তোমার পূজন।
সীতারাম দাস গায় নায়েকেরে বরদায়
হবে প্রভু জি [বি] ত বাহন॥

ইহাতে পূজার দিন ভাদ্র মাসের শুক্লাষ্টমী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু পঞ্জিকায় ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী এই পূজার দিনরূপে নির্দিষ্ট। স্মার্ত রঘুনন্দন এই পূজার কোনও উল্লেখ করেন নাই। শব্দকল্পদ্রুম গ্রন্থের পরিশিষ্টে বাচস্পতিমিশ্রকৃত চমৎকারচন্দ্রিকা নামক গ্রন্থ হইতে একটি শাস্ত্রীয়বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। সেই বচন অনুসারে গৌণ আশ্বিন মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে পুত্রসৌভাগ্যকামনায় নারীগণের শালিবাহন রাজপুত্র জীমূতবাহনের পূজা কর্তব্য। শ্রীসুখময় সরকার বাঁকুড়ায় অনুষ্ঠিত জিতাষ্টমীর ও আনুষঙ্গিক জীমূতবাহন পূজার বিবরণ দিয়াছেন (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৬১, পৃ. ৫২৯-৩০)।

মঙ্গলকাব্যের পুথির সাধারণ পরিচয় পত্রিকার প্রবন্ধে এবং 'বিবরণে'র ভূমিকায় পাওয়া যাইবে। কবীন্দ্রের কালীর মঙ্গলের একখানি পুখির কথা এই ভূমিকায় উল্লিখিত হইয়াছে, আর একখানি পুথির অংশ হইতেছে ৯২৭ সংখ্যক পুথি। অকিঞ্চন দাস ও দ্বিজ মধুকণ্ঠের জগন্নাথমঙ্গল (২৬৪৯, ৮৪৭), দামোদর দাসের শ্রীদারুব্রহ্ম (৯৪৯) ও কালিদাস বসুর নীলাদ্রিচন্দ্রিকার (৯৪২, ১৬৪১) কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার। দ্বিজ কবিচন্দ্রের কপিলামঙ্গলের দশ খানি পুথি ও দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীর আট খানি পুথি ইহাদের জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য দান করে। গঙ্গা ও সরস্বতীর বন্দনার স্বতন্ত্র পুথি অনেকগুলি আছে। কবিকঙ্কণের গঙ্গার বন্দনার পাঁচখানি পুথি, নিধিরামের আট খানি, দ্বিজ অভিরামের এক খানি ও কবি শঙ্করের এক খানি। সরস্বতীর বন্দনা আছে বাসুদেব দাসের দুই খানি, কৃষ্ণচরণের এক খানি ও শ্যামাচরণের এক খানি। ইহা ছাড়া, জয়কৃষ্ণ দাসের মদনমোহনের বন্দনা তিন খানি, গোবিন্দরামের কালিঞ্জরের বন্দনা (১৫৫০), কবি বিষ্ণুদাস ও ৯৭৪ মল্লাব্দে রচিত কবি মন্ধানের দিগ্‌বন্দনা, শ্যাম শর্মার দিগ্‌দেবী বন্দনা (৯২৯) উল্লেখযোগ্য। ১০৭৭ সালের হস্তলিখিত কলিমঙ্গলে (২৪০৬) ও বাঞ্ছারাম দেব রচিত কলিমাহাত্ম্যকথায় (৯৩৩) কলির অধর্ম ও অনাচারের বর্ণনা

দেওয়া হইয়াছে। বৈদ্যনাথমঙ্গলে (২৩৫৩) বৈদ্যনাথ শিবের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিজ রামচন্দ্রের দুর্গামঙ্গল-নল দময়ন্তী (১৯০৬) ও গৌরীমঙ্গল (১৮০৫) উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত ও মুদ্রিত হয়। রামচন্দ্রের মাধবমালতীর পুথিও (৯৬২) পরিষদে আছে। এই পুথির লিপিকাল ১২৪০ সাল। পুথিগুলি মুদ্রিত সংস্করণ হইতে নকল করা হইয়া থাকিতে পারে। পরিষদের পুথিশালার শৃঙ্গাররসপদ্ধতি (২১২৫) ও শৃঙ্গারতিলকপদ্ধতি (২৩৮৬) মুদ্রিত পুস্তকের প্রতিলিপি (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩৯।১৫৯)।

সংস্কৃত পুরাণ, শাস্ত্রগ্রন্থ ও অন্যান্য গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত গ্রন্থের মধ্যে প্রথমে কয়েকখানি তন্ত্র বিষয়ক গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে। এই বিভাগে শ্রীনাথের কামরত্ন (২৬৯৬), ভূতডামর তন্ত্র (১৮২৭), ব্রহ্মানন্দের [কৌলমার্গ] (২৭১০), ও হরমেখলা (২৬৮৫) উল্লেখযোগ্য। স্মৃতিশাস্ত্রে পাতি লিখিবার ধারা (২৩৬৯), গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের দায়ভাগ ও অশৌচ ব্যবস্থা (২৭১১), দ্বিজ কালীশঙ্করের অশৌচ ব্যবস্থা নির্ণয় (২৬৯৫), রাধাবল্লভ শর্মার স্মৃতিকল্পদ্রুম—শ্রাদ্ধমঞ্জরী (১৫৬১); বৈদ্যকশাস্ত্রে রামনাথ বৈদ্যের রোগবিবরণ (২৬৬২), বালবোধিনী (২৬৫৯); কামশাস্ত্রে শৃঙ্গারপদ্ধতি (২১২৫), শৃঙ্গারতিলক পদ্ধতি (২৩৮৬), রসিকদাসের রতিবিলাস পদ্ধতি (২১৩০), পদ্মপুরাণানুবর্তী রতিশাস্ত্র (৯২৫, ১৫৫২, ২১২৯); জ্যোতিষশাস্ত্রে পঞ্জিকায় উদ্ধৃত জ্যোতিষবচনের অর্থ (২৫৩৯); অলঙ্কার ও সঙ্গীতশাস্ত্রে কবিবল্লভের রসকদম্ব (১৪৯৩), পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী (১৯৯, ৯৮১), রাধামোহন প্রভুর শিষ্য উদ্ধবদাসকৃত তালমালা ও রাগমালা (২১২৭) নানাদিক দিয়া আলোচ্য। শাস্ত্রাতিরিক্ত গ্রন্থের মধ্যে নীতিশ্লোকের অনুবাদ[৪] (৩৬৬, ৯৪১, ২১৪৯), হিতোপদেশ (২১৫৯), সিংহাসন বত্রিশা (৮৯৫), বত্রিশ পুত্রিকার পুস্তক (৮৯৪) ও মহিম্নঃস্তব (২১৫০) উল্লেখযোগ্য। একখানি নামহীন খণ্ডিত পুথিতে (২৪২৭) জীবহত্যার অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন প্রসঙ্গে শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তাহাদের অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

বৈষ্ণব পদাবলী শাখায় চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন (১৭৯) নানা কারণে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, বাসুদেব ঘোষ, বলরাম দাস, নরোত্তম দাস, রায় শেখর, ভূপতি নাথ, দ্বিজ ধনঞ্জয়, গৌরকিশোর দাস, দ্বিজ রামচন্দ্র—ইঁহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র পদসংগ্রহের পুথি আছে। বিভিন্ন কবির পদাবলী সংগ্রহের মধ্যে অনেকগুলিতেই সংগ্রাহকের কোনও নাম পাওয়া যায় না। নামযুক্ত সংগ্রহের মধ্যে পাওয়া যায় হরিবল্লভ বা বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর গীতচিন্তামণি (৯৮২খ, ২৫৪৯), রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসমুদ্র (৯৮২ চ, ২৫৪৬, ২৩৭২), বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরু বা গীতকল্পতরু (২৩৭৪, ২৩৭৩, ২০৫৮,

---

৪. কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার নাম মোহমুদ্গর (৮৫৭-৯, ১৬৭৩)। এই জাতীয় একখানি গ্রন্থের নাম ব্যবহারপ্রদীপ (১৫৬০)।

২০৫৭, ৯৮২ ঙ) ও ১২১৩ বঙ্গাব্দে রচিত ও ১২১৪ বঙ্গাব্দের হস্ত লিখিত কমল শ্রীকরণের পদরত্নাকর (৯৫৩)। শাক্তপদাবলীর মাত্র একখানি পুথি আছে (২২৬৯)।

কতকগুলি পুথিতে পারিবারিক বা স্থানীয় ইতিহাস ভূগোল সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলি বিশেষ প্রাচীন না হইলেও মূল্যবান্। বিজয়রাম সেনের তীর্থমঙ্গল (২১৪৪) পরিচিত গ্রন্থ। ইহার একটি সংস্করণ পরিষদ্-গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। মহানন্দ চক্রবর্তীর তীর্থযাত্রার নির্ণয় (১৯৬৫), ব্রহ্মপুত্র তীর্থযাত্রা বর্ণনা (১৯৬৬), শ্রীক্ষেত্র তীর্থযাত্রাবর্ণনা (১৯৭০), রেলপথভ্রমণ বর্ণনা (১৯৭১), পাকুড়ের প্রাচীন রাজবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (১৯৭২) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মহানন্দ পাকুড়-রাজের কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন মনে হয়। শ্রীক্ষেত্র তীর্থযাত্রা বর্ণনের পুথির মধ্যে পাওয়া একখানি কাগজে কবির বংশলতিকা লিপিবদ্ধ আছে। তাহাতে কবির পূর্বপুরুষ রঘুনাথ দুবের নাম আছে। রঘুনাথের পুত্র প্রাণবল্লভ পাকুড়ের জমিদারের নিকট হইতে চক্রবর্তী উপাধি লাভ করেন এবং বংশানুক্রমে ইহা ব্যবহৃত হইতে থাকে। মহানন্দের গ্রন্থ-রচনার কাল ১২৬৮ সাল হইতে ১২৮০ সাল পর্যন্ত। মহানন্দ নানা কাজে ব্যস্ত থাকিতেন এবং অবসরমত গ্রন্থ রচনা করিতেন। গঙ্গার জন্মবৃত্তান্ত ও রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডের উপসংহার ভাগ হইতে ইহা জানা যায়। দেশের দুঃখকষ্টের চিন্তা কবিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। তিনি কোন কোন গ্রন্থের শেষে দেশের অনাবৃষ্টি ও অজন্মার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

১২৬৬ সালের ৯ই শ্রাবণ এই তারিখযুক্ত স্যমন্তক মণিহরণের পুথির শেষে তিনি নৈরাশ্য প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—

অবশেষ নাহি ভাষ কেমনে রচিব।
অনাবৃষ্টি হৈল দেশ কিসে রক্ষা পাব ॥

১২৭৪ সালের ফাল্গুনে প্রারব্ধ ও ১২৭৫ সালের শ্রাবণ মাসে সমাপ্ত রামায়ণের আদিকাণ্ডের শেষে তিনি বলিয়াছেন—

ঘন না বরিষে ঘন এই [বড়] খেদ ॥
অতি মন্দ বরিষণ অনাবৃষ্টি প্রায়।
সবে চিন্তাকুল সে সময় বঞ্চয় ॥

১২৮০ সালের কোজাগর পূর্ণিমায় সমাপ্ত রামায়ণ উত্তরাকাণ্ডের পুথিতেও অনুরূপ উক্তি দেখা যায়—

বৃষ্টি বিনে সৃষ্টি নাশ লোকে কষ্ট পায়।
কোথা শস্য উপজিল কোথা কিছু নাই ॥
গ্রামে উপজিল শস্য জল বিনে মরে।
কিঞ্চিৎ হইলে বারি রক্ষা পাইতে পারে ॥

গগনে মেঘের নাহি দেখিয়ে সঞ্চার।
আরম্ভ হইল শীত বৃষ্টি হওয়া ভার॥
যেছিল সম্বল তাহা হইল অবশেষ।
এবি কি হইবে তাই ভাবিয়া অশেষ॥

প্রসঙ্গক্রমে রাজার অসুখে রাণী কর্তৃক রাজ্য পরিচালনার উল্লেখ করা হইয়াছে—

বেদনায় শ্রেষ্ঠ বাবু আছেন কাতর।
ভূপতি বিহীনে রাণী রাজ্য অধিকারী॥

মহানন্দের রেলপথ ভ্রমণ বর্ণনা একটি কৌতুকপূর্ণ রচনা। মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে মফস্বল হইতে রেলযোগে কলিকাতায় আসার একটি সরস বিবরণ ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। রেলপথ প্রবর্তনের সমসময়ের কবির লিখিত এই বিবরণ কল্পনাপ্রসূত হইলেও ইহা নূতন যন্ত্রদর্শনে তৎকালীন জনসমাজের বিস্মিত মনোভাবের অকৃত্রিম চিত্র প্রকাশ করিতেছে। ইতিহাসের দিক দিয়া ইহার মূল্য যাহাই হউক না কেন বাঙালি পাঠক ইহা পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন সন্দেহ নাই। আধুনিক যুগের গোড়ার দিকের এই সাহিত্যসাধক আজ বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত।

জাতিগত ইতিহাসের দুইখানি ছোট পুথি আছে। একখানি পরমেশ্বরী দত্তের তিলি জাতির কুল আর্যা (২৫৩৬), অপরখানি তন্তুবায় কুলপঞ্জি (২১৫৮)। চরিতকাব্যের মধ্যে মথুরদাসের মুরারিচরিত্র (২৬২চি) উল্লেখযোগ্য।

অনেকগুলি পুথি অত্যন্ত খণ্ডিত—বিচ্ছিন্ন কয়েকটি পাতা মাত্র রক্ষিত হইয়াছে। ইহাদের বিষয়বস্তু দুর্বোধ্য। কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া যাইতেছে। ইহার সাহায্যে অনতি প্রাচীনকালের বাঙালি চিন্তাধারার নানাদিকের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অক্ষরচৌতিশায় (১৫৫৪-৫) ককারাদি বর্ণের সাহায্যে কৃষ্ণের মহিমা প্রকাশ করা হইয়াছে। যথা—

চএ বলে চিন মন চৈতন্ন থাকিতে।
চিত্তভ্রম হৈয়া লুক চলে অন্যপথে॥
চিন রে পরমপদ লয় পরিচএ।
চারিবেদে কহে হরি তুমি দয়ামএ॥

আজ্ঞির চৌতিশায় (৯৩৯) ককারাদি বর্ণের সাহায্যে নীতিকথা বলা হইয়াছে। যথা—

আজ্ঞি অক্ষরের আদি নহে চৌতিশার ভিন্ন।
আজ্ঞির আকৃতি নাই অক্ষরের চিহ্ন॥
আজ্ঞির প্রলাপে গিয়া সঙ্গে আদি পাএ।
আদি অনাদি দেব বন্দম মাতাএ॥
কদাচিত না ছাড়িঅ আপনার ভোল।
কুটুম্ব অধীন হৈলে জীবন বিফল॥

কুৎসিত আচার কর্ম্ম কভু না করিঅ।
কুচ[রিত্র] লোকেরে জে ইষ্ট না বলিঅ ॥
খর কথা না কইঅ রাজার সাক্ষাত।
খলতা বাড়াইলে পুনি হইব বিবাদ ॥

জ্ঞানভারত (২৩৩৩) নাম দেখিয়া ইহাকে মহাভারতের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া মনে হইতে পারে। ইহার একটিমাত্র রক্ষিত পত্র হইতে ইহার সঠিক বিষয় নির্ণয় করা যায় না। ইহার আরম্ভ এইরূপ—

জ্ঞানভারথ পুস্তক লিক্ষতে।
বিজয়পণ্ডিত নামে পুরথি।
দিগ্‌বিজয়তুল্য পণ্ডিত হৈল জেন মতে ॥
চরণে পূজিঞা তার বিদ্যালাভ হৈল ॥
সেই গুরুপ্রসাদে হৈল বিচক্ষণ।
রচিল গোপ্ত কথা শ্রীগুরুচরণ ॥
গুরুমুখে যত কথা ভেদ পাইল।
জ্ঞানভারথ নামে পুস্তক রচিল ॥
... ...
শুন ভাই সর্ব্বজন বচন স্থসার।
গুরুর প্রসাদে বিদ্যা পাইল অনন্তার ॥
ছোটবড় গুরু কাকো না করে ঘৃণা।
তে কারণে পাইল বিদ্যা করিয়া কামনা ॥
বিজয়ের ল পণ্ডিত পাইল যেবা স্থানে।
চরণে ভজিয়া বিদ্যা লইলো ভাল মনে ॥

সোনা রুপা এবং উহু শব্দের শ্লোকের (২১৩৩) ইহার প্রথম দিকটা হেঁয়ালির মত—

সোনা রুপা তামা কাসা রাঙ্গী লোহা পিতল সিসা।
ধান চাউল চিরা খই পত্র মাটি করি লৈ। সোলক১
মানব কথাএ পীতল লই চিরা রাঙ্গ কোরি হএ।
সোনা তামা ধান পত্র পাই। ২। কোরি চিরা চাউল
লএ মাটি তামা লোহা হএ। ইচ্ছা হইলে পিতল রুপা লই ॥ ৩ ॥

উহু শব্দের শ্লোকের বিষয় এইরূপ—বিক্রমাদিত্য তাঁহার নবরত্নসভায় উহুশব্দের মাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিলে পণ্ডিতগণ বলেন—যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধিলে তিনি 'উহু' বলিয়াছিলেন, অর্জুন স্থভদ্রাকে হরণ করিবার সময় স্থভদ্রা 'উহু' বলিয়াছিলেন, রাজপুত্রের বিরহে রাজকুমারী 'উহু উহু' করিয়াছিলেন, কুলবধূগণ হাতে শাঁখা পরিবার সময় 'উহু উহু' করেন—এইরূপ উহু শব্দের অনেক মাহাত্ম্য আছে।

কাপাসের পালায় (৪২৫) কাপাসের মাহাত্ম্য উল্লিখিত হইয়াছে—

বৎসরের মধ্যে ভাই কাপাস ফসল।
ইহাতে পরম সুখী সংসার সকল॥
লোকের কারণে সৃষ্টি করিল ঈশ্বর।
সভার বাসনা বড় পরিতে কাপড়॥
... ...
সকলের মধ্যে ভাই কাপাস ফসল।
অনেক আসয় করে সংসার সকল॥
দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় করিয়া ভাবনা।
সর্ব্বেশ্বর সভাকার পূরাহ বাসনা॥

সইসাঙ্গাতীর কথার (৯২০) দ্বিতীয় পত্রটি মাত্র রক্ষিত হইয়াছে। ইহা হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

... ... রভূঞি নগরে।
বিবিরা সয়ান করে প্রতি ঘরে ঘরে॥
গোড়ন্দাযে নন্দির মাঝে লাগ্যা গেল ঘটা।
ধুম ধুম ধুম পড়িছেরে কি লাগিল হলো কুটা॥
ঘরকে আসি দুই জনাতে যুক্তি কৈল মনে।
আমরা করিব সই কার ঘরের সনে॥
দেখি আগে সকল লোকে কেমন রূপ করে।
আমার মনে সাদ আছে করিব রায়ের ঘরে॥
ইতর যতেক লোক কাছে থাকে বস্যা।
তারা দোই সাঙ্গাতির কথা শুন্যা সবাই মরে হাস্যা॥
... ...
বাপ বড়াপের শ্রাদ্ধ গেল সোইসাঙ্গাতি হৈল।
ঘরের শালগ্রাম চাউল না পায় মনসাদেবী আইল॥
বিষ্ণুপুরে ঘরে ঘরে বাজিছে বাজনা।
সয়ার হাথে হাথ দিঞা ফিরিছে কতজনা॥
... ...
আমি আপন জালায় পুড়্যা মরি মাগি হৈল কাল।
আজি করি সই সাঙ্গাতি পাছে হবে শাল॥
জনমে জনমে নাহি হবে হেন সুখ।
দয়ারাম দ্বিজে কয় দেখ সইয়ের মুখ॥

বেথুন সোসাইটি

সপ্তম প্রস্তাব

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

দীর্ঘ তের বৎসর যাবৎ বেথুন সোসাইটি দেশী-বিদেশী বিদগ্ধ ব্যক্তিদের মিলন-ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। বিবিধ বিদ্যার আলোচনায় তাঁহারা অভিনিবিষ্ট হন। ভারতীয় সমাজের কল্যাণকর নানা বিষয়েরও আলাপ-আলোচনা হইত এখানে। আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে দেখিয়াছি, এখানকার অধিবেশনগুলিতে যে-সব বিষয় আলোচনা হইত তাহাকে ভিত্তি করিয়া কলিকাতার কতকগুলি সুফলপ্রদ প্রতিষ্ঠানও ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের কথা এখানে বলিতে পারি। আবার ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে একটি মিলন-ক্ষেত্র রচনায়ও যে ইহা সাহায্য করিতে পারে সে সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র সেন পূর্ব্ব বৎসরে একটি বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছিলেন। বোম্বাইয়ের কোন কোন বিদ্বান্ ও সমাজ-নেতা এখানে আসিয়া বক্তৃতা দিয়া যান। ভারতবর্ষে তখনও সেন্সাস গ্রহণ শুরু হয় নাই। মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ সরকারীভাবে সেন্সাস গ্রহণের ছয়-সাত বৎসর পূর্ব্বেই বেথুন সোসাইটির একটি বিশেষ অধিবেশনে ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এইরূপে শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজকল্যাণকর বিষয়াদি সম্বন্ধে সুধীবৃন্দ সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা দান করিতে থাকেন।

সোসাইটি চতুর্দ্দশ বৎসরে (১৮৬৬-৬৭) পদার্পণ করিল। এবারে সোসাইটির মাসিক অধিবেশন হইল পাঁচটি এবং বিশেষ অধিবেশন দুইটি। দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন নিয়মিত অধিবেশন বলিয়া ধরিলে অবশ্য ছয়টি মাসিক অধিবেশনই হইয়াছিল। সোসাইটির ছয়টি বিভাগের কার্য্য প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। তবে মাসিক অধিবেশনগুলি প্রতি মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবারে যথারীতি হইতে লাগিল। আলোচ্য বৎসরের বিশেষ অধিবেশনগুলি বেশ মনোজ্ঞ ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল। সভাপতি জি. বি. ম্যালেসন প্রথম অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এই প্রথম অধিবেশনে সভাপতির কার্য্য করেন শিক্ষা-বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর হেনরি উড্রো। সভাপতির ভাষণে প্রথমেই তিনি বলেন যে, বিভাগগুলির কার্য্যকারিতা সকলেই স্বীকার করিলেও ইহার কার্য্য প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সোসাইটির আর্থিক অবস্থাও তেমন আশাপ্রদ নয়। এই দুইটি বিষয়ের দিকে তিনি সদস্যদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিলেন। এই দিনের বিশেষ কার্য্য—বেথুন সোসাইটির দুইজন প্রধান সদস্যের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ। এই বিষয়ে এখন বলিতেছি।

বিগত বৎসরে কলিকাতায় লর্ড বিশপ কটন এবং রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ মৃত্যুমুখে পতিত হন। সভাপতি উড্রো বক্তৃতায় কটনের গুণপনা এবং আকস্মিক মৃত্যু সম্বন্ধে একটি

মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন। লর্ড বিশপ কটন সোসাইটির একজন বান্ধব ছিলেন। তিনি এখানে তিনটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। শেষ বক্তৃতা মাত্র পূর্ব্ব বৎসর প্রদত্ত হয়। পূর্ব্ব প্রবন্ধে ইহার আভাস দিয়াছি। এই সময়ে, ষষ্ঠ দশকের মাঝামাঝি, ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে জাতি-বৈরিতা বা জাতি-দ্বেষিতা প্রকট হইয়া উঠে। এই জাতি-বৈরিতা প্রশমনকল্পে যে-সব ইউরোপীয় অগ্রণী হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে লর্ড বিশপ কটন ছিলেন শীর্ষস্থানে। কটন ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের ভিতরে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। উড্রো বলেন, তিনি আসাম-ভ্রমণে কটনের সঙ্গী হইয়াছিলেন। তখন তিনি তাঁহার মানব-প্রীতি, বিশেষতঃ ভারতবাসীদের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগের বহু নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেন। আসাম-ভ্রমণ পরিসমাপ্তির পর ষ্টীমারে কুষ্টিয়ায় তাঁহারা আসেন। কূলে উঠিবার কালে কটন জলে পড়িয়া ডুবিয়া যান, শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহার আর খোঁজ মিলিল না। উড্রোর চোখের সম্মুখেই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল।

রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ছিলেন সোসাইটির অন্যতর সহকারী সভাপতি। সোসাইটির বিবিধ কর্ম্মে তাঁহার সহায়তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সে যুগে কলিকাতায় যত রকম জনহিতকর অনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল তাহার প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গেই প্রতাপচন্দ্রের যোগ ছিল। এইমাত্র যে আর্ট স্কুলের উল্লেখ করিলাম তাহার স্থাপনায় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও তদীয় ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ইহার জন্য লোয়ার চিৎপুর রোডে একখানি ভবন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন যে, প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যুতে সোসাইটি একজন সত্যকার বান্ধব হারাইলেন। কটন ও প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যুতে সোসাইটি দুইটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রতাপচন্দ্রের উপর শোকপ্রস্তাবটি এই :

> "That this Society deeply deplores the death of their Vice-President, the late Rajah Pertap Chunder Singh Bahadur, whose many amiable qualities, united to the possession of a princely fortune, enabled him to win the esteem and admiration of the Society by his kindly disposition, his graceful manners and his liberal contribution in furtherance of the objects of the Society.
>
> "They accordingly desire to record their appreciation of the qualities and their sense of gratitude for the many benefits conferred by him upon the Society."

সোসাইটির দ্বিতীয় অধিবেশন হইল পরবর্ত্তী ১৩ই ডিসেম্বর ১৮৬৬ তারিখে। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ। সোসাইটির স্থায়ী সভাপতি জি. বি. ম্যালেসন অনিবার্য্য কারণে পদত্যাগ করিয়াছেন। তিনি সোসাইটির পরম হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, পূর্ব্বে বক্তৃতাও দিয়াছেন কোন কোন বিষয়ে। ইউরোপীয় ও ভারতীয়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনে বিশপ কটনের ন্যায় তিনিও বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তিনি এদেশীয় ভাষা জ্ঞাত থাকায় দেশীয়দের মনোভাব জানিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার পদত্যাগে সকলেই অত্যন্ত বিমর্ষ হন। একটি উপযুক্ত প্রশংসাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সভা নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলেন।

সোসাইটির অধ্যক্ষ-সভা ম্যালেসনের স্থলে সভাপতি পদে নিয়োগ করেন হাইকোর্টের বিচারপতি জন বাড ফিয়ারকে। ফিয়ার সাধারণ সভায় বিশেষভাবে অভিনন্দিত

হইলেন। তিনিও ছিলেন ভারতবাসীর দরদী বান্ধব। বিভিন্ন জনহিতকর কার্য্যে তিনি ও তাঁহার পত্নী নিজেদের ব্যাপৃত করেন। গত শতাব্দীর ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকের বহু সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের ঐকান্তিক সহায়তালাভে সমর্থ হইয়াছিল। ফিয়ার সভাপতির প্রথম ভাষণে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সভাপতি ম্যালেসনের গুণপনার বিশেষ উল্লেখ করেন। সোসাইটি ইউরোপীয় ও ভারতীয়ের মিলন-ক্ষেত্র এবং উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের একটি প্রধান উপায়। তিনি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি-স্থাপনের একটি উৎকৃষ্ট পন্থার বিষয় ভাষণে উল্লেখ করেন। ইউরোপীয় ও ভারতীয় সমাজের নারীজাতির ভিতরে পরিচয় স্থাপন এবং ভাবের আদান-প্রদান করিতে পারিলে মিলনের প্রতিকূল বাধাগুলি বিদূরিত হইতে পারিবে। তিনি এইজন্য এখানকার স্ত্রীশিক্ষার যথাযোগ্য আয়োজনের কথা পাড়িলেন। যেটুকু আয়োজন চলিয়াছে প্রয়োজনের তুলনায় তাহা সামান্য বটে, কিন্তু আশাপ্রদ সন্দেহ নাই। এই সভায় কুমারী মেরী কার্পেণ্টার উপস্থিত ছিলেন। ফিয়ার তাঁহার উপস্থিতির বিষয় সকলকে জানান। তাঁহার দ্বারা এ দেশে নারীজাতি যে বিশেষ বল পাইবে তাহাও তিনি বলিতে ভুলিলেন না। কুমারী কার্পেণ্টার নারীজাতির শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন এবং এ সমুদয়ের উন্নতির পন্থা নির্ণয়ের জন্য ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি পর পর কয়েকবারই ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি এই অধিবেশনের দুই দিন পূর্ব্বে সোসাইটির এক বিশেষ অধিবেশনে বক্তৃতা করেন। ইহার কথা পরে বিশদভাবে বলা যাইবে।

সোসাইটির তৃতীয় অধিবেশন হয় ১৮ই জানুয়ারী, ১৮৬৭ তারিখে। বিচারপতি ফিয়ার যথারীতি সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। এ দিনকার বক্তা—প্রাক্তন সভাপতি মেজর জি. বি. ম্যালেসন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয়—"The Empire of Akbar" বা আকবরের সাম্রাজ্য। ম্যালেসন ঐতিহাসিক বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। গত শতাব্দীতে ভারত-ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের ভিতরে ম্যালেসনের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। আকবর এবং তাঁহার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, শাসন-প্রণালী, হিন্দু-মুসলমানে ব্যবহার-সাম্য প্রভৃতি সম্বন্ধে বর্ত্তমান কালের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই অল্পবিস্তর অবগত আছেন। ম্যালেসন নিজ বক্তৃতায় এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন। তিনি বক্তৃতার উপসংহারে একটি বিষয়ের প্রতি শ্রোতাদের মনোযোগ বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিলেন। তিনি বলেন—

> "The successors of the adventurers who followed Clive are better administrators than the adventurers who followed the son of Humayun. It is for the people of Hindustan to point the moral. Let them shew themselves in all things capable, let them cast aside those prejudices which weigh them down with the weight of ignorant ages, let them shew themselves as enlightened as the most enlightened monarch of Hindustan, and it is certain that they will then no longer have to complain that India is not even in this respect governed on the principles of Akbar."

ম্যালেসনের উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, হুমায়ুনের বংশধরেরা এদেশীয়দের মধ্যে এক শ্রেণীর বীর্য্যবান্ ও শাসনদক্ষ লোক পাইয়াছিলেন যাঁহারা তাঁহাদের সঙ্গে আগত মোগলদের অপেক্ষা ছিলেন উন্নততর। কিন্তু ক্লাইবের সমকালীন ও পরবর্তী ইংরেজেরা ঐসকল মোগল অভিযানকারীদের অপেক্ষা নানা বিষয়ে উন্নততর ছিলেন। তাঁহাদিগকে দেশ-শাসন কার্য্যে লাগান হইয়াছে। তাঁহারা এদেশীয়দের দ্বারা উন্নততর বিবেচিত হইতেছেন। ভারতবাসীদের উচিত, এখন তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে বিশেষভাবে চেষ্টা করা। তাহা হইলে তাঁহারাও ক্রমে দেশ শাসনে আগের যুগের মত অংশ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবেন।

ম্যালেসনের এই উক্তির মধ্যে সেযুগের সদাশয় মহানুভব ইংরেজদের মনোবৃত্তির প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহারা, শুধু তাঁহারা কেন, ভারতীয়রাও তখন এদেশ যে একদা স্বাধীন হইতে পারিবে এরূপ হয়ত কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

সোসাইটির চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে (১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৮৬৭) সভাপতি ফিয়ার উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাঁহার স্থলে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন স্যামুয়েল লব্। সোসাইটি সংক্রান্ত ঘরোয়া মামুলি কার্য্য সম্পন্ন হইবার পর লব্ বলেন যে, গত ও বর্ত্তমান সেসনে এখন পর্য্যন্ত একজন মাত্র ভারতীয় সোসাইটিতে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তিনি আশা করেন যে, ভারতীয় সুধীবৃন্দ অধিক সংখ্যায় বক্তৃতাদি দিতে আগাইয়া আসিবেন। সোসাইটির অন্যতম প্রধান সদস্য কিশোরীচাঁদ মিত্র ইহার উত্তরে বলেন, কার্য্যবিবরণী দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, ভারতীয়েরা উক্ত বিষয়ে কখনও পশ্চাৎপদ নন, তবে সাময়িকভাবে হয়ত কিছুকাল এরূপ হইয়া থাকিবে। এ দিনের বক্তা রেভারেণ্ড ডন। বক্তৃতার বিষয়—"Oliver Cromwell"। অলিভার ক্রম্‌ওয়েল ইংলণ্ডের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। রাষ্ট্রে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় যে কয়জন বীর ইংরেজ অগ্রণী হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ক্রম্‌ওয়েলের নাম সকলের আগে মনে পড়ে।

সোসাইটির পঞ্চম অধিবেশন হইল পরবর্ত্তী ১৪ই মার্চ্চ, ১৮৬৭ তারিখে। এদিন সোসাইটির স্থায়ী সভাপতি ফিয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এদিনকার বক্তা ছিলেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, তাঁহার বক্তৃতার বিষয়—"Hindu Philosophy" বা হিন্দু-দর্শন। মূল বক্তৃতাটি আমরা সোসাইটির প্রবন্ধ-পুস্তকে পাই না বটে, তবে যে সারাংশ কার্য্যবিবরণে মুদ্রিত হইয়াছে তাহা হইতে ঐ সময়ে বিদগ্ধ-সমাজে হিন্দু-দর্শন সম্বন্ধে কি ধারণা প্রচলিত ছিল জানা যায়। বক্তা প্রথমেই এইরূপ একটি মতবাদের উল্লেখ করেন যে, কাহারও কাহারও ধারণা গ্রীক-দর্শন হইতে হিন্দুর ষড়দর্শনের উৎপত্তি। তিনি যুক্তিপ্রমাণ প্রয়োগে দেখাইলেন, হিন্দু-দর্শন গ্রীক-দর্শনের বহু পূর্ব্বেকার এবং দুইটিই সহজভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। তবে গ্রীক-দর্শনে হিন্দু-দর্শনের প্রভাব পড়া বিচিত্র নহে। ঐ সময়কার আর একটি মতবাদ এই যে, হিন্দুর ষড়দর্শন বৌদ্ধ-দর্শনের পরবর্ত্তী এবং ইহা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। বৌদ্ধ মতবাদ সাংখ্যদর্শন অনুযায়ী হওয়ায় এইরূপ ধারণার উদ্ভব হইয়াছে। বক্তা এই মতবাদও ক্ষালন করিতে সমর্থ হন। বক্তা ইহার পর হিন্দু-দর্শনের বিবিধ পর্য্যায় বা স্তর বৈদিক যুগ হইতে পৌরাণিক যুগ পর্য্যন্ত বিশদ ভাবে আলোচনা করেন।

২

সোসাইটির বিশেষ অধিবেশন দুইটির কথা এখন বলিব। প্রথম বিশেষ অধিবেশন হইল ১১ই ডিসেম্বর ১৮৬৬ তারিখে। বিচারপতি ফিয়ার সভাপতি হইলেন। এ দিনের প্রধান বক্তা ছিলেন কুমারী মেরী কার্পেণ্টার। তাঁহার বক্তৃতার বিষয়—"The Reformatory School System and its influence on Female Criminals"। কুমারী মেরী কার্পেণ্টার সম্বন্ধে অন্যত্র কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি। তিনি সমাজকল্যাণে একান্তভাবে আত্ম-নিয়োগ করেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার আরও একটি পরিচয় আছে। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের বিলাত-প্রবাস কালে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং *Last days of Rajah Rammohan Roy* শীর্ষক একখানি পুস্তক লেখেন। যৌবনকাল হইতেই তিনি ভারতবর্ষের একজন হিতৈষী বন্ধুরূপে কার্য্য করিতে থাকেন। কিন্তু বিলাতেও সমাজ-কল্যাণকর কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া তিনি স্বদেশবাসীর বিশেষ প্রীতি-শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেন। তিনি সমাজকল্যাণ উদ্দেশ্যে যে বিশেষ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাই ছিল এই বক্তৃতার মূল বিষয়বস্তু—অর্থাৎ, বিবিধ কিশোর অপরাধীদের সংশোধন ব্যবস্থা এবং বালিকা অপরাধীদের উপর উহার প্রভাব।

কুমারী কার্পেণ্টারের বক্তব্য বিষয় কতকটা সীমিত হইলেও তিনি এ বিষয়ে বলিবার পূর্ব্বে নিজ কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে কিছু বলিলেন। তিনি তাঁহার পিতার নিকট শিক্ষালাভ করেন। শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থালী কাজকর্ম্মেও দক্ষ হইয়া উঠেন। তিনি যৌবনে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে বন্ধুদের সঙ্গে বালিকাদের সাধারণ শিক্ষা, সীবন শিক্ষা ও ছোট ছোট শিল্প শিক্ষারও আয়োজন করিয়াছিলেন। এখানে শিক্ষিত হইয়া বহু ছাত্রী শিক্ষাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, কেহ কেহ গৃহিণী হইয়াছেন, আবার কেহ কেহ সমাজ সেবায়ও তৎপর হইয়াছেন। কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত তিনি এই কার্য্যে লিপ্ত থাকেন। এই সময়ে তিনি দেখিলেন সমাজে অল্পবয়স্ক বালক-বালিকা, ধরুন সাত-আট বৎসর বয়স, নানারূপ অপরাধে দণ্ডিত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইত। কারাগার হইতে বাহির হইয়া তাহারা পূর্ব্ববৎই থাকিয়া যায়, বরং তাহাদের অপরাধপ্রবণতা ক্রমশঃ বাড়ে এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দাগী আসামীতে পরিণত হয়। পাঁচ বার কি সাত বার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াও তাহাদের স্বভাব কিছুতেই শোধরায় না। সামান্য দুই একবার এরূপ কারাজীবন যাপন করিলেই যে ভয়ঙ্কর দাগী বনিয়া যায় তাহা নহে। কিন্তু ক্রমান্বয়ে জেল খাটিয়া তাহারা স্বভাব-দুর্বৃত্ত হইয়া যায়। ইহারই ফলে সমাজের অশুভ ঘটেও বিস্তর।

এই বিষম অবস্থার প্রতিকার মানসে কুমারী কার্পেণ্টার একটি 'রিফর্মেটরি স্কুল' খুলেন। কিন্তু শিশু ও কিশোর অপরাধীদের পাইবেন কোথা হইতে? তাহারা তো দণ্ড লইয়া কারাগারে আশ্রয় লয়। তিনি কারামুক্ত কিশোরদের সংশোধনাগারে প্রথমে স্থান দিতেন। যাহাতে অপরাধী অল্পবয়স্কদের কারাগারে না পাঠাইয়া রিফর্মেটরি স্কুলে পাঠানো হয় সে উদ্দেশ্যে আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিলেন। সাত বৎসর কাল তিনি অপরাধী বালকদের

ছাত্ররূপে গ্রহণ করিয়া বিদ্যালয় পরিচালনা করিতে থাকেন। ইহাতে বেশ সুফল পাওয়া গেল। কর্তৃপক্ষ এ ব্যবস্থায় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। ১৮৫৪ সালে পার্লামেণ্টে শিশু-অপরাধীদের সম্পর্কে এই মর্ম্মে আইন পাস হইল যে, দণ্ডপ্রাপ্ত শিশু ও কিশোরদের কারাগারে না পাঠাইয়া রিফর্মেটরি বিদ্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অন্যূন সাত বৎসর হইতে অনধিক ষোল বৎসর পর্য্যন্ত দণ্ডপ্রাপ্ত শিশু ও কিশোরদের এই ধরণের বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইবে। বলাবাহুল্য, কুমারী কার্পেণ্টারের স্কুলের আদর্শে বহু বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। সরকার এ বিষয়ে তাঁহাকে ও অন্যান্য উদ্যোক্তাদের সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিতে শুরু করিয়া দেন। প্রথমে মেয়ে অপরাধীদের নিমিত্ত তিনি এ ব্যবস্থা করেন নাই, মাত্র পাঁচ-ছয় বৎসর পূর্ব্ব হইতে তাহাদের জন্যও বিদ্যালয় খোলা হইতেছে। তিনি অতঃপর মেয়ে অপরাধীদের কথাই বিশেষভাবে বলিলেন। তাহারা স্বাধীন দেশের অধিবাসী। তাহারা উচ্ছৃঙ্খল, একগুঁয়ে ও অসংযত আচরণের নিমিত্ত কুখ্যাতি লাভ করিয়াছে বিস্তর। তাহাদিগকে স্কুলের নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে আনিতে তাঁহাকে ও তাঁহার সহকর্ম্মীদিগকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে। তিনি সঙ্গে করিয়া এই সব অপরাধী ও অপরাধপ্রবণ মেয়ের কতকগুলি ফোটো আনিয়াছিলেন—স্কুলে প্রবেশকালীন ফোটো এবং স্কুল হইতে বিদায়কালীন ফোটো। পাঁচ-ছয় বৎসর নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে থাকিয়া জীবনযাপন করিবার ফলে তাহাদের চেহারার কতই না পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! কুমারী কার্পেণ্টার বলেন, এই সব মেয়ের অনেকে এখন ভদ্রভাবে জীবিকা অর্জ্জনে নিয়োজিত হইতেছে। সমাজ তাহাদের দ্বারা উপকৃত না হইয়াই পারিবে না। বক্তা এদেশে শিশু ও কিশোর অপরাধীদের সংখ্যাল্পতা দেখিয়া যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করেন। তবে এখানেও যে রিফর্মেটরি স্কুলের মত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে উপকার হইবে তাহা তিনি আহ্মেদাবাদে কতকগুলি উচ্ছৃঙ্খল এবং পরিত্যক্ত অনাথ শিশু দেখিয়া হৃদয়ঙ্গম করেন। রিফর্মেটরি স্কুলে অনুসৃত শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, সাধারণ বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সেলাই শিক্ষা ও কিছু কিছু কুটীর শিল্পও ছাত্রীদের শেখানো হয়। ইহার ফলে তাহারা গৃহকর্ম্মে সুনিপুন হইয়া থাকে। শিক্ষিত ও আচরণে ভদ্র হওয়ায় পরিবারে তাহারা হয় পত্নী নয় পরিচারিকারূপে গৃহীত হইয়া থাকে। বাংলার মনোমোহন ঘোষ এবং বোম্বাইয়ের বালকৃষ্ণ তাঁহার বিদ্যালয় দেখিয়া আসিয়াছেন।

বক্তৃতা শেষ হইলে সভাপতি ফিয়ার উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে কুমারী কার্পেণ্টারকে প্রশ্ন করিতে বলেন। পাদ্রী লঙ্ প্রশ্ন করেন—তাঁহার বিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয় কিনা। উত্তরে কার্পেণ্টার বলেন যে, অন্যান্য বিষয়ের মত এ বিষয়েও প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। লঙের আর একটি প্রশ্নের উত্তরে কুমারী কার্পেণ্টার বলিলেন যে, জায়গার অসংকুলানহেতু ছাত্রীদের উদ্যান-রচনা (gardening) সবক্ষেত্রে শেখানো সম্ভব নয়। ব্রিটেনের শহরগুলিতে যে-সব ঘরবাড়ী আছে তাহাতে বাড়তি স্থান নাই বলিলেই হয়। তথাপি যেটুকু জায়গা পাওয়া যায় তাহাতে ফুলগাছ

জন্মানো হয়। ব্রিটিশ জাতি ফুলের এত প্রিয় যে, জানালার ফাঁকে ফাঁকে পর্য্যন্ত ছোট টব বসাইয়া বহু ফুলগাছ জন্মায়। ফুটন্ত ফুলে শুধু গৃহস্থেরাই আনন্দ পায় না, পথচারীদেরও উহা আনন্দবৰ্দ্ধন করে। এদেশে এত জমি-জায়গা থাকা সত্ত্বেও ফুল গাছের অভাব দেখিয়া কুমারী কার্পেণ্টার বিস্ময় প্রকাশ করেন।

সভাপতি ফিয়ার উপসংহার-বক্তৃতায় কুমারী কার্পেণ্টারকে বিশেষ সাধুবাদ করিলেন। তিনি বলেন যে, কুমারী কার্পেণ্টার এদেশে শিশু ও কিশোর অপরাধীদের অবস্থা-দৃষ্টে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবিকই এই ধরণের অপরাধীর সংখ্যা যে খুবই কম, নিজ ক্ষমতাধিকার বলে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন তাহার ভিত্তিতে ইহার সত্যতা তিনি যাচাই করিতে পারেন। তিনি ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে, এদেশীয়দের ভিতরে যৌথ-পরিবার প্রথা বলবৎ থাকায়ই ব্রিটেনের মত এখানে এরূপ সম্ভাবনা ঘটে নাই। এখানে পরিবারে অক্ষম, অন্ধ, খঞ্জ এবং বেকার লোকদেরও অন্ন-সংস্থানের সুযোগ হয় এই যৌথ-পরিবার প্রথার দরুন। ইহার মন্দ দিক সম্বন্ধে তিনি কম অবহিত নন, কিন্তু এ বিষয়ে ইহার বিশেষ উপকারিতা আছে। তবে এদেশেও যে শিশু-অপরাধী একেবারে নাই এমন কথা তিনি বলেন না। এখানেও রিফর্মেটরি স্কুল স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা আছে। ফুলের অভাবের কথাপ্রসঙ্গে ফিয়ার বলেন, কুমারী কার্পেণ্টার এমন সময় এদেশে পদার্পণ করিয়াছেন যখন ফুল তেমন জন্মে না। তিনি বর্ষাকালে একবার ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং তখন ফুলের রকমারি ও প্রাচুর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ঋতুবিশেষে ফুলের উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইংরেজের চেয়ে ভারতবাসীর সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা আদৌ কম নয়।

সোসাইটির দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন হইল ২:শে এপ্রিল ১৮৬৭ তারিখে। ফিয়ার পূর্ব্ববৎ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এদিনে বিশেষ বক্তা ছিলেন সিংহলের আইন-সভার সদস্য মুথু কুমারস্বামী। তিনি তখন সবেমাত্র উত্তর-ভারত পরিভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয়—উত্তর-ভারত-পরিক্রমা কুমারস্বামী বিভিন্ন অঞ্চলের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া বারাণসীধাম সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। ভারতবর্ষের প্রধানতম তীর্থ বারাণসী বা কাশীধাম। এখানকার বিশ্বেশ্বরের মন্দির এবং গঙ্গার ঘাটগুলি পর্য্যটকদের বিশেষ আকর্ষণ স্থল। ভারতের স্থাপত্যরীতির বৈশিষ্ট্য এই মন্দিরেই বিধৃত হইয়াছে। গঙ্গার ঘাটসমূহে বিবস্ত্র সাধুগণ প্রত্যেকেরই নজরে পড়িবে। একজন সাধুর কথা তিনি বিশেষভাবে বলেন—তাঁহার নাম তৈলঙ্গ স্বামী। তিনি তেলেঙ্গা তথা মাদ্রাজ হইতে আগত। কুমারস্বামী স্বয়ং তাঁহাকে দেখিয়াছেন। আচারে-আচরণে মনুষ্যেতর জীব বলিয়াই তাঁহাকে কিন্তু মনে হইবে। তবে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর সিদ্ধপুরুষ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে যেমন পুণ্যকামীরা আসিয়া এখানে ভীড় করেন, তেমনি সাধু-সন্ন্যাসীরাও নানাস্থান হইতে আসিয়া থাকেন। বারাণসীধাম সংস্কৃত-শিক্ষার এবং সংস্কৃত শাস্ত্র-চর্চ্চার একটি

প্রধান কেন্দ্র। বারাণসীর গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে দেশ-বিদেশের বুধমণ্ডলী আলোচনা-গবেষণার অনেক মাল-মশলা পাইয়া থাকেন। ফ্রান্সের একজন বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিদের সঙ্গে এখানে তাঁহার সাক্ষাৎলাভ ঘটে। এই সংস্কৃত ভাষায় ও সাহিত্যের মাধ্যমে প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব হইয়াছে। সংস্কৃত-চর্চ্চার পুনঃপ্রচলনের নিমিত্ত তিনি আবেদন জানান।

আবার বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের সাক্ষাৎ মেলামেশার সুযোগ ঘটিয়াছে তীর্থ-পর্য্যটন দ্বারা। রামেশ্বরম্ হইতে কাশীধাম পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র তীর্থ-পর্য্যটনের নিমিত্ত ভারতবাসীরা আসা-যাওয়া করিয়া থাকেন। জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় এযুগেও যে ইহার বিশেষ আবশ্যকতা আছে তাহা তিনি খুব জোরের সঙ্গে বলেন। কি দক্ষিণী, কি উত্তর-ভারতীয় সকল অধিবাসীদের মধ্যেই ধর্ম্মগত ও সংস্কৃতিগত আচার-আচরণে ঐক্য পরিদৃষ্ট হয়। ইহারও কারণ উল্লিখিত দুইটি বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন—যথা, সর্ব্বত্র সংস্কৃত-চর্চ্চা এবং তীর্থ পর্য্যটন। প্রাচীনদের মত পুণ্যার্জ্জন মানসে হয়ত এখন আর আমরা তীর্থ-পর্য্যটন করি না, কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়া তথাকার অধিবাসীদের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হওয়া বর্তমান যুগে একান্ত দরকার। তিনি এই প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেনের দক্ষিণ-ভারত পরিক্রমার কথা উল্লেখ করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাইয়ের সুপণ্ডিত ভাওদাজীও কয়েকজন সঙ্গী লইয়া উত্তর-ভারতে পর্য্যটন করিয়া কলিকাতার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে এরূপ গমনাগমন এবং ভাবের আদান-প্রদান একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

বক্তৃতা শেষে কেহ কেহ আলোচনায় যোগদান করেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর বলেন, এখন সংস্কৃতের দোহাই দিয়া কোন ফল হইবে না। কুমারস্বামী ইহার এই বলিয়া উত্তর দেন যে, বর্ত্তমানে ইংরেজী আমাদের জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সবিশেষ অনুকূল সন্দেহ নাই, কিন্তু সংস্কৃত-চর্চ্চার দ্বারা আমরা পুরাতন শাস্ত্র, ঐতিহ্য, ইত্যাদির বিষয়ে নিজেদের যেমন জানিতে ও বুঝিতে পারিব এমনটি আর কিছুর দ্বারা সম্ভব নহে। সভাপতি ফিয়ার বক্তাকে ধন্যবাদ দিয়া বলেন যে, মুথু কুমারস্বামী ভারতীয়দের ভিতরে ঐক্যের বিষয় যাহা বলিয়াছেন তাহা সর্ব্বপ্রকারে প্রযোজ্য হইতে পারিলে তিনি খুবই আনন্দিত হইতেন। সমাজের জন্মগত, শ্রেণীগত ভেদাভেদ বিদূরিত না হইলে এবং সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার প্রসার না ঘটিলে সত্যকার ঐক্যের সম্ভাবনা অতি অল্প। এইরূপে বিশেষ অধিবেশন পরিসমাপ্ত হইল।

স্বরলিপি

রামনিধি গুপ্ত (১১৪৮-১২৪৫) সাধারণ্যে নিধুবাবু বলিয়া পরিচিত। মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পূর্বে ১২৪৪ সালে রামনিধি "গীতরত্ন" নামক গ্রন্থে তাঁহার সঙ্গীত-সংকলন প্রকাশিত করেন। এই গ্রন্থটি ১২৫৩ সালে রোজারিও সাহেবের যন্ত্রে পুনর্মুদ্রিত হইয়া উক্ত সাহেবের পুস্তকালয় হইতে প্রচারিত হয়। অতঃপর ১২৭৫ সালে গ্রন্থটি তদাত্মজ জয়গোপাল গুপ্ত কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া "নৃত্যলাল শীল দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।"

"গীতরত্ন" গ্রন্থে এই গানের সুর লিখিত আছে বেহাগ। "বাঙ্গালীর গান" এবং "প্রীতিগীতি" গ্রন্থে ইহার সুর ঝিঁঝিট-খাম্বাজ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই গানগুলির সুর সম্পর্কে ইহা বলা আবশ্যক যে পুরাতন গ্রন্থাদিতে যে সমস্ত সুর দেওয়া আছে তাহাদের সহিত গায়ক পরম্পরায় প্রচলিত সুরগুলির অনেক ক্ষেত্রে মিল নাই। পূর্বপ্রচলিত সুর এবং বর্তমানে প্রচলিত সুরেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে গায়কভেদে সুরের পরিবর্তন হইয়াছে। আবার কোন কোন গ্রন্থে সুরের উল্লেখ সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন লওয়া হয় নাই। এই সব গানের প্রকাশিত স্বরলিপি না থাকায় সুর সম্পর্কে সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের মতই নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে করি।—শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

খাম্বাজ। ত্রিতাল

চন্দ্রাননে কি শোভা কমল নয়ন।
ভুরু ভৃঙ্গ ভঙ্গি করি করে মধুপান॥
কেশ বেশ কি তাহার
কিবা নীরদ আকার
মনশিখী তাহা দেখি হরিষে অজ্ঞান॥
শ্রবণে শোভে কুণ্ডল
চমকে অতি চঞ্চল
কিরণ ঝলকে তায় দামিনী সমান॥

রামনিধি গুপ্ত : নিধুবাবু

সুর-সংগ্রাহক। শ্রীকালীপদ পাঠক   স্বরলিপি। শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

II	গা	গা	গা	গমপা	।	-মগরা	গা	মা	গা	।
	চন্	দ্রা	ন	নে০০		০ ০ ০	কি	শো	ভা	
	-া	গা	মা	পা	।	ক্ষা	পা	-া	-া	I
	•	ক	ম	ল		ন	য়া	০	০	

-মপা -মগা -রগা -মপা । -া -া গা মা ।
০০ ০০ ০০ ০০ ০ ন্ ভু রু

ধা -া ধা -া । -া -া গা -মা I
ভু ঙ্ গ ০ । ০ ০ ভ ঙ্

পধা -র্ণসা -র্সণা -ধণা । ধা পা -া -া ।
গি০ ০০ ০০ ০০ ক রি ০ ০

পা মপা -ধণা -ধপা । মা গা -া -া I
ক রে০ ০০ ০০ ম ধু ০ ০

গমা -পধা -ধধা -পমা । -গমা -পপা -পপা -মগা ।
পা০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

-রগা -মগা -রসা -া । -া -া -া -া II
০০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ন্

II মা -া ধণা -র্সণা । -ধপা -ধনা -া -া ।
কে শ্ বে০ ০০ ০০ ০০ ০ শ্

না র্সা নর্সা -া । -া -া -া -া I
কি তা হা ০ ০ ০ ০ র্

না না না র্সা । র্সর্রা -নর্সা ধর্সা ণর্সা ।
কি বা ণী র দ০ ০০ আ০ কা০

-ণধা -পধা -া -া । -া -া -া -া I
০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ র্

গা মা গা মা । পা পধা -ণধা -পধা ।
ম ন শি খী তা হা০ ০০ ০০

-নর্সা না র্সা -া । র্সা নর্সা -র্রর্গা -র্মা I
০০ দে খি ০ । হ রি০ ০০ ০

-র্মর্গাঃ -র্রঃ না র্সা । নর্সা -র্রর্রা -র্সণা -ধণা ।
০ ০ যে অ জ্ঞা০ ০০ ০০ ০০

-র্সর্সা -ণধা -পধা -ণধা । -পমা -গা -রগা -া II
০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ ন্

II মা মা ধণা -র্সণা । ধা -পধনা না না ।

শ্র ব ণে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ শো ভে

র্সা না র্সা -া । -া -া -া -া I

কুন্ ড ল ০ ০ ০ ০ ০

না না না না । র্সা র্সর্রা -র্সা -নর্সা ।

চ ম কে অ তি চ ০ ০ ০ ন্

ধর্সা ণর্সা -ণধা -পধা । -া -া -া -া I

চ ০ ল০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

গা মা গা মা । পা পধা -ণধা -পধা ।

কি র ণ ঝ ল কে০ ০ ০ ০ ০

-নর্সা না -র্সা -া । র্সা নর্সা -র্র্গা -র্মা I

০ ০ তা ০ য়্ দা মি০ ০ ০ ০

-র্মর্গাঃ -র্রঃ না র্সা । নর্সা র র্রা র্সণা ধণা ।

০ ০ নী স মা০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

-র্সর্সা -ণধা -পধা -ণধা । -পমা -গা -রগা -া II II

স ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

জন্ম ৩০ নভেম্বর ১৮৫৮ মৃত্যু ২৩ নভেম্বর ১৯৩৭

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৬৫ বর্ষ ৩য় সংখ্যা
১৩৬৫

মৈথিলী শাক্ত-সাহিত্য

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

বাঙলার অন্যতর প্রতিবেশী সাহিত্য মৈথিলীতে শক্তিবাদকে অবলম্বন করিয়া অনেক রকম সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। কয়েক শত বর্ষ পূর্বেও গৌড়বঙ্গ, মিথিলা ও কামরূপ ধর্ম-সংস্কৃতিতে একটি ঐক্যবদ্ধ জনপদ ছিল এবং এই অঞ্চলটি তন্ত্র-সাধনা ও শক্তি-সাধনার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। বাংলা-সাহিত্যের পরে শাক্ত-ধর্ম ও শাক্ত-সাহিত্যের প্রাধান্য মৈথিলীতেই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব হইতেই আমরা মিথিলায় শাক্ত প্রভাবের প্রমাণ পাই। পুরাণতত্ত্ববিদ্ ডক্টর রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা মহাশয়ের মতে পুরাণোক্ত নরকাসুরের উৎপত্তি মিথিলায়। কালিকা-পুরাণের ৩৮শ অধ্যায়ে দেখিতে পাই, নরকাসুরকে বিষ্ণু কামরূপে (কিরাত দেশে) প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং কামাখ্যা দেবীর সেবক হইয়া থাকিতে বলিলেন। খ্রীষ্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতক এই কালে কামরূপ এবং মিথিলা উভয় দেশেই শাক্ত ধর্মের প্রচার হইয়াছিল মনে হয়। বিহারের সর্বশ্রেণীর উচ্চ-বর্ণের হিন্দুগণের মধ্যে নানা রকমের শাক্ত ধর্মের প্রচলন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এখন পর্যন্ত কলিকাতাস্থিত কালীঘাটের কালী (কালী কলকত্তেওয়ালী) এবং কামরূপের কামাখ্যা ইঁহাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় যাত্রিগণের ভিড়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বিহারবাসি-গণের।

শিব, শক্তি ও বিষ্ণু—এই তিন দেবতাই হইলেন মিথিলার জনপ্রিয় দেবতা। উচ্চ-বর্ণের মৈথিলী হিন্দুগণ সাধারণতঃ কপালে যে রেখাঙ্কন দিয়া থাকেন তাহাও এই শিব, বিষ্ণু ও শক্তিরই প্রতীক বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়। কপালে ডাইনে-বাঁয়ে পাশাপাশি যে তিনটি ভস্মরেখা উহা শিবের দ্যোতক, লম্বালম্বি তিনটি শ্বেত চন্দনের রেখা বিষ্ণুর দ্যোতক এবং রক্তচন্দন বা সিন্দূরের বিন্দুটি হইল শক্তির দ্যোতক।[১] মিথিলার বহু পরিবারেই 'গোসাউনিক ঘর' দেখিতে পাওয়া যায়।[২] এখানকার প্রতিষ্ঠিতা দেবী হয় ভদ্রকালী, না হয় তারা

---

১. "The simultaneous threefold marks on the forehead of the Brahmanas represent this characteristic of the Maithilis: the three horizontal lines of the sacred ashes represent their devotion to Shiva, the vertical white sandal paste represents their faith in Vishnu, and the dot of red sandal paste or of vermillion represents their veneration for Shakti."—Jayakanta Mishra, *History of Maithili Literature*, Part I, p. 19.

২. গোসাউনী=গোস্বামিনী=দেবী ; শিব হইলেন গোস্বামী=গোসাঁই।

বা দুর্গা, অথবা দেবীর অন্য কোনও মূর্তি। বহু গৃহী উপাসক শক্তিমন্ত্রে পারিবারিক গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মিথিলায় কতকগুলি প্রসিদ্ধ শক্তিতীর্থও রহিয়াছে, তাহার মধ্যে উচ্চৈঠ, চণ্ডিকাস্থান, উগ্রতারাস্থান, চামুণ্ডাস্থান এবং জনকপুর অতি প্রসিদ্ধ। বর্ণপরিচয়ের পরে মৈথিলী শিশুদের প্রথম যে শ্লোকটি মুখস্থ করিতে দেওয়া হয় তাহা হইল—

সা তে ভবতু সুপ্রীতা দেবী শিখরবাসিনী।
উগ্রেণ তপসা লব্ধো যয়া পশুপতিঃ পতিঃ॥

বাঙলাদেশে যে শারদীয়া মৃন্ময়ীদেবী পূজার প্রচলন আছে তাহার ঠিক সমপরিমাণে না হইলেও মিথিলাতেও এই সময় মৃন্ময়ী দুর্গাপূজার প্রচলন আছে। এই সকল ব্রাহ্মণ দ্বিজগণ গৃহ ও পরিবারের কল্যাণ কামনায় চণ্ডী পাঠ করেন। দশহরা মিথিলার একটি বড় ধর্মোৎসব। মাঘমাসে মিথিলায় 'পাতড়ি' উৎসব হয়, এই উৎসবে দেবীর অংশস্বরূপ কুমারী-গণকে ক্ষীর (পায়স) খাওয়ান হয়। ব্রজ-অঞ্চলে আশ্বিন মাসে এইরূপ কুমারী-ভোজনের উৎসব আছে, তাহাকে বলা হয় 'কন্যা-লাঁগুরা'; ইহা দেবী-আরাধনারই বিশেষ একটি অঙ্গ। মিথিলায় যে সকল আলপনা অতি জনপ্রিয় সেই সব আলপনা তন্ত্রের 'যন্ত্র' হইতেই গৃহীত হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। এই ভাবে আমরা নানা দিক হইতে মিথিলায় একটা ব্যাপক শাক্ত প্রভাব লক্ষ্য করিতে পারি।

কবি বিদ্যাপতির সময় হইতে আমরা হর-পার্বতীকে অবলম্বন করিয়া একরূপ মঙ্গল-গীতির জনপ্রিয়তা দেখিতে পাই। সঙ্গীতগুলি মুখ্যতঃ লোকসঙ্গীত। কবি বিদ্যাপতির নামে যে সংগীতগুলি সংগৃহীত আছে তাহারও অধিকাংশই মেয়েদের মুখে মুখে প্রচলিত, লোকমুখ হইতেই সংগৃহীত। গানগুলি মুখ্যতঃ হর-গৌরীর বিবাহ, দাম্পত্য-জীবন ও গার্হস্থ্যজীবন সম্পর্কিত। এইগুলি বিবাহ-কালে মঙ্গল-সংগীত রূপেই এখনও মিথিলায় গীত হইয়া থাকে। আমরা পূর্বে বিবিধ প্রসঙ্গে বিদ্যাপতির হর-পার্বতী-বিষয়ক কিছু কিছু গানের উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। এখানে অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার কর্তৃক সঙ্কলিত বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত এই জাতীয় আরও কিছু কিছু গান লইয়া আলোচনা করিতেছি। একটি পদে গৌরী-অভিলাষী যতিবেশধারী শিবকে দেখিয়া মাতা মেনকা বলিতেছেন—

এতএ কতএ অএল জতি গোরি অছ তপে।
রাজরে কুমারি বেটি ডরব দেখি সাপে॥
তোড়ব মোয় জটাজুট ফোড়ব বোকানে।
হটল ন মান জতি হোএত অপমানে॥
তীনি নঅন হর বীসয জর দহনূ।
উমা মোরি মন্থরি হেরহ জনু॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন জগমাতা
ও নহি উমত ত্রিভুবন দাতা॥ —১৭৬ সং

'এখানে কোথা হইতে আসিল যতি, গৌরী আছে তপে। রাজার কুমারী আমার মেয়ে, সাপ দেখিয়া ডরিবে। আমি ছিঁড়িয়া দিব জটাজুট, ফুড়িয়া দিব ঝুলি; হটাইলে যদি না মানে যতি, (তাহা হইলে) হইবে অপমান! তিন-নয়ন হর, (তৃতীয় নয়নে) বিষম অগ্নি জ্বলে; উমা আমার নবনী-কোমল—যেন না দেখে। বিদ্যাপতি বলেন, শুন জগন্মাতা, ও নয় উন্মত্ত—ত্রিভুবনের দাতা।'

কিন্তু মেনকার অনিচ্ছাসত্ত্বেও দেখা হইল, তপোবনেই গিয়া যতি নিজে উমার সঙ্গে দেখা করিয়া ভাব করিবার চেষ্টা করিয়াছে। উমা বিস্মিত হইয়া বাড়ি ফিরিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে—

এ মা কহএ মোয়ঁ পুছোঁ তোহী।
ওহি তপোবন তাপসি ভেটল
কুসুম তোরএ দেল মোহী॥
আঁজলি ভরি কুসুম তোড়ল
জে জত অছল জঁাহা।
তীনি নয়নে খনে মোহি নিহারএ
বইসলি রহলি জঁাহা॥
গরা গরল নয়ন অনল
সির সোভইহ্নি সসী।
ডিমি ডিমি কর ডমরু বাজএ
এহে আএল তপসী॥
সির সুরসরি ভ্রমু কপালা
হাথ কমণ্ডলু গোটা।
বসহ চঢ়ল আএল দিগম্বর
বিভূতি কএল ফোটা॥
ন বিদ্যাপতি সামিক নিন্দা
ন কর গৌরী মাতা।
তোহর সামি জগত ইসর
ভুগুতি মুকুতি দাতা॥—৭৭৭ সং

'এ মা, আমাকে কহ, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ওই তপোবনে এক তপস্বী দেখা দিল, কুসুম তুলিয়া দিল আমাকে। অঞ্জলি ভরিয়া কুসুম তুলিল, যেখানে যত ছিল যাহা; আমি যেখানে বসিয়াছিলাম সেখানে তিন নয়নে ক্ষণে আমাকে দেখিল। গলায় গরল, নয়নে অনল, শিরে শোভে শশী; ডিমি ডিমি করিয়া ডমরু বাজাইয়া এখানে আসিল তপস্বী। শিরের সুরসরিৎ (গঙ্গা) কপালে ভ্রমিতেছে, হাতে একটি কমণ্ডলু, বৃষভে চড়িল, আসিল দিগম্বর, বিভূতি (ভস্ম) দিয়া করিল ফোঁটা। না (কহে) বিদ্যাপতি,

স্বামীর নিন্দা করিও না গৌরী মাতা; তোমার স্বামী জগতের ঈশ্বর—ভক্তি-মুক্তি-দাতা।'

বিবাহ উপলক্ষ্যে হর-গৌরী বিষয়ক এই গানগুলি করিবার একটি বিশেষ সামাজিক তাৎপর্য আছে। গানগুলির ভিতর দিয়া নানাভাবে দাম্পত্য-জীবন সম্বন্ধে একটি ভারতীয় আদর্শই বর-কন্যা এবং আড়শী-পড়শী সকলের কাছে বড় করিয়া তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা। সে আদর্শটি হইল এই, স্বামী বয়সে একটু বেশি হোক, দরিদ্র হোক, দেখিতে আপাত-রমণীয় না হইয়া রুক্ষ হোক, পরিচ্ছদে আভরণে সজ্জায় বিলেপনে চিত্তাকর্ষক না হোক, এমন কি ধাম-কুল-গোত্রহীন হোক---তথাপি স্ত্রীর লক্ষ্য করিতে হইবে তাহার আন্তর ঐশ্বর্য; সেই ঐশ্বর্য যদি তাহার থাকে তবেই সে-ই হইবে সর্বাপেক্ষা বরণীয়। উমামহেশ্বরের সকল কাহিনীর বিবিধ বিস্তারের মধ্যেও এই ভারতীয় আদর্শই কবিকল্পনাকে নাড়া দিয়াছে। পরবর্তী কালের লোকেরা যখন দেখিল যে উমা-মহেশ্বরের ভিতর দিয়া এই ভারতীয় আদর্শটি স্পষ্ট মূর্তি লাভ করিয়াছে তখন বিবাহ উপলক্ষ্যে এই বিষয়ক গানই লোকপ্রিয় হইয়া উঠিল। এই আদর্শের আর প্রকাশ রাম-সীতার মধ্যে, এই জন্যই বিবাহের গান হয় হর-গৌরী না হয় রাম-সীতাকে লইয়া। বিদ্যাপতির এই পদগুলির মধ্যে দেখি, হরকে দেখিয়া মেনকা ভয় পাইল, পার্বতীও প্রথমে সামান্য যেন একটু দ্বিধান্বিত হইল; কিন্তু একটু পরেই দেখি---

> জোগিয়া মন ভাবই হে মনাইনি।
> আএল বসহা চটি বিভূতি লগাএ হে।
> মন মোর হরলনি ডামরু বজাএ হে॥
> সুন্দর গীত অজর পতি সে নাহে।
> চিত সোঁ নই ছুটথি জানথি কিছু টোনা হে॥---৭৭৮ সং

'হে মা মেনকা, যোগিয়া মন ভাবায়। আসিল বৃষভে চড়িয়া—বিভূতি লাগাইয়া, মন আমার হরিয়া লইল ডমরু বাজাইয়া। সুন্দর গাত্র, অজর (জরারহিত) পতি সেই নাথ চিত্ত হইতে ছোটে না—কিছু 'টোনা' (মন্ত্রতন্ত্র) নিশ্চয়ই জানে!'

ইহার পরে হর-পার্বতীর বিবাহের দৃশ্য—সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা যেরূপ যেরূপ দেখিয়া আসিয়াছি এবং বাঙলা সাহিত্যে তাহার যেরূপ বিস্তার দেখিয়া আসিয়াছি—ঠিক সেই রূপই। সেই ডমরু-হস্তে ভস্ম-বিভূষিত রূপ! বর আসিলে সবাই ধাইয়া চলিল বর দেখিতে, তাহার পরে অন্যত্রও যাহা এখানেও ঠিক তাহাই—

> পরিছয় চললি মনাইনি সব গাইনি।
> নাগ কয়ল ফুফুকার দুরহ পড়াইলি॥
> এহন উমত বর কেকর উর বিসধর।
> গৌরি বরু রহথু কুমারি করব বর দোসর॥—৭৭৯ সং

'স্ত্রী-আচারে চলিল মেনকা সব গায়নীকে লইয়া; নাগ করিল ফোঁস্ ফোঁস্—সকলে দূরে

পালাইল। এমন উন্মত্ত বর কাহার ?—বক্ষে বিষধর! গৌরী বরঞ্চ কুমারী থাকুক—অন্য বর করাইব।'

পরের পদেও দেখি মেনকা সখেদে বলিতেছেন—

মঙ্গল বিলুবিঅ সিন্দুর পিঠারে।
তোঁহে ভলি সোপলি সাজলি ছারে॥
চলহ চল হর পলটি দিগম্বর।
হমরি গোসাউনী তোহ ন জোগ বর॥
হর চাহ গুরু গউরবে গোরী।
কি করব তবে জপমালী তোরী॥
নঅনে নিহারব সম্ভ্রম লাগী।
হিমগিরি ধীএ সহব কইসে আগী॥
ভাল বলই নয়নানল রাসী।
ঝরকত মউল ডাঢ়তি পটবাসী॥—৭৮০ সং

'মঙ্গল সাজাইলাম সিন্দুর ও পিটালি দিয়া, তোমাকে ভাল সঁপিলাম—তুমি সাজিয়া আছ ছাইতে। চল হে চল, হে দিগম্বর ফিরিয়া চল, আমার ঈশ্বরীর তুমি নও যোগ্য বর। হর হইতে গৌরী গৌরবে গুরু, তোমার জপমালা তবে কি করিবে? সসম্ভ্রমে তোমার নয়নে নেহারিবে, হিমগিরি দুহিতা কি করিয়া সহিবে অগ্নি? ভালে জ্বলিতেছে নয়নানল রাশি, ঝলসিয়া যাইবে গৌরীর মুকুট, জ্বলিয়া যাইবে পট্টবাস।'

পরের পদটিতেও (৭৮১ সং) দেখি মেনকার সেই একই আক্ষেপ। জটাজুট ঝুলাইয়া বলদে চড়িয়া আসিয়াছেন বর, কে বর—কে বরযাত্রী কিছুই বুঝিবার উপায় নাই! ভস্মের ঝোলা লইয়া আসিয়াছেন বিবাহের উপঢৌকন! বিবাহের অন্য আচার-বিধি কিছুই মানেন না—শুধু পাশা খেলা—আর সাপ লইয়া ছুটোপুটি। শুধু কি তাই?—

খিরি ন খাএ হর চুকতি গঞ্জাএ।
এহন উমত কোনে জোহল জমাএ॥— ৭৮১ সং

'খিরি (পরমান্ন) খায় না হর—গাঁজাতেই অবসান (গাঁজা পাইলেই হইল)। এমন উন্মত্ত বর কে যোগাড় করিয়া দিল?'

ইহার পরে বিবাহ বর্ণনা। এ-প্রসঙ্গে বাঙলা সাহিত্যে যে স্থূল রসিকতার আমদানি দেখিয়া আসিয়াছি মৈথিলী বিদ্যাপতিও সেখানে কোনও ব্যতিক্রম সৃষ্টি করেন নাই।

জখনে সঙ্করে গৌরি করে ধরি আনলি মণ্ডপ মাঝ।
সরদ সঁপুন জনি সসধর উগল সময় সাঁঝ॥
চৌদহ ভুঅন সিব সোহাওন গৌরী রাজকুমারি।
হেরি হরখিত ভেলি মদাইনি আএল জনি জভারি॥
হেমত সরির পুলকে পূরল সফল জনম মোরি।